শুকতারা
অষ্টাত্রিংশৎ বর্ষ
ষষ্ঠ সংখ্যা
শ্রাবণ • ১৩৯২

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

Hard Copy - Library
Scan & Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

শেখা আর খেলা

এই সংখ্যায় তোমরা
কাগজ ভাঁজ করে
'খেলনা প্লেন' তৈরি করবে

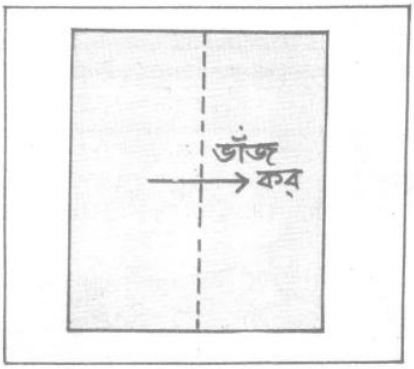
ভাঁজ
কর

ভাঁজ
খোল

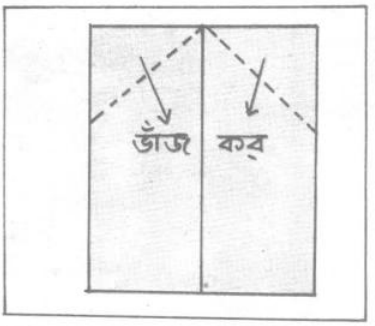
ভাঁজ কর

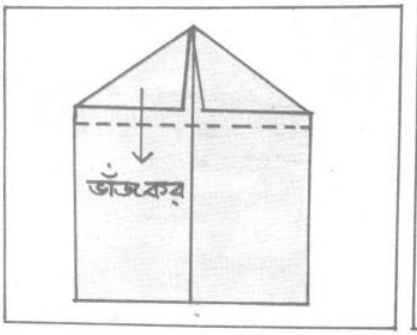
ভাঁজ কর

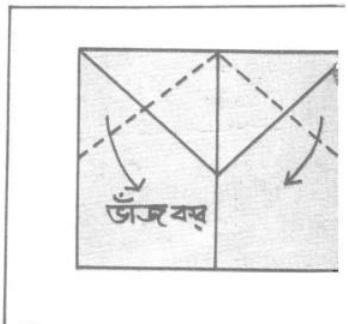
ভাঁজ কর

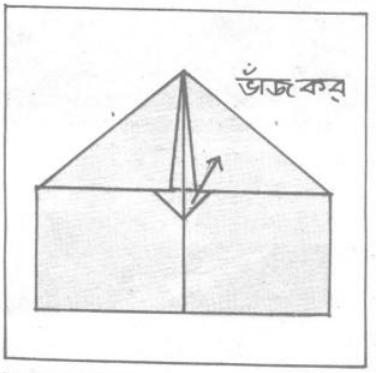
ভাঁজ কর

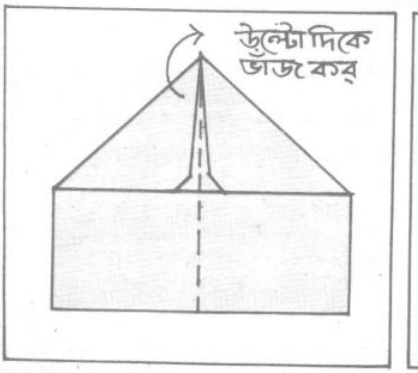
উল্টো দিকে
ভাঁজ কর

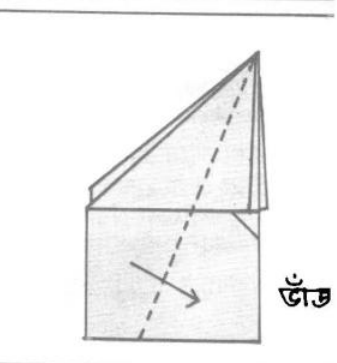
ভাঁজ

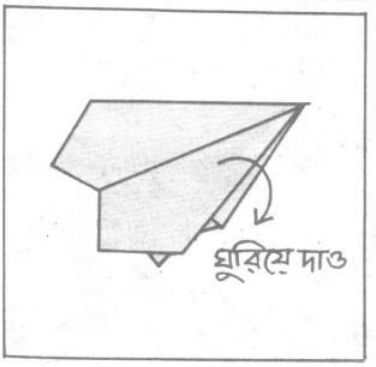
ঘুরিয়ে দাও

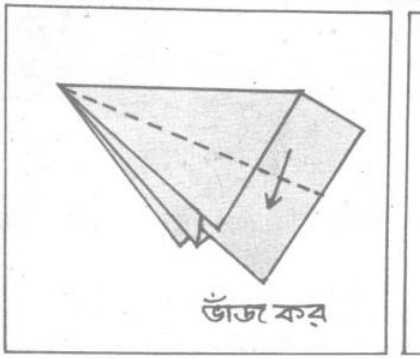
ভাঁজ কর

এবারে ● চিহ্নিত অংশ
বাতাসে ছুঁড়ে মারো দে
তোমার প্লেন কেমন উড়

বাঁটুল দি গ্রেট

ইকিরে দাদা! সারা অঞ্চলটাতেই দেখছি যে যার কাজ ফাঁকি দিয়ে ঘুম লাগাচ্ছে। এদের জাগানো দরকার!
আমি খোল বাজিয়ে সকলকে তোলবার চেষ্টা করি।
জাগো—জাগো ওগো পুরবাসী...
ইঃ! কানের পর্দা একেবারে ফর্দাফাঁই করে দিলে!
ঘুম ভেঙে জাগো সবে...
ওফ!
আফস!
আলসেমি ঝেড়ে উঠে পড়ো তেড়ে...
আরগহ!
দুঃখিত মেয়র। আমি কিছু গান বাজনা দিয়ে এই জায়গাটা প্রাণবন্ত করতে চেষ্টা করছিলাম।
তুমি এই খোল দিয়েই সব গোল পাকিয়ে ফেলেছো!
মনে পড়েছে—আমি আমার বিউগলটা ব্যবহার করবো! ওটাতে কোন ক্ষতি হবে না।

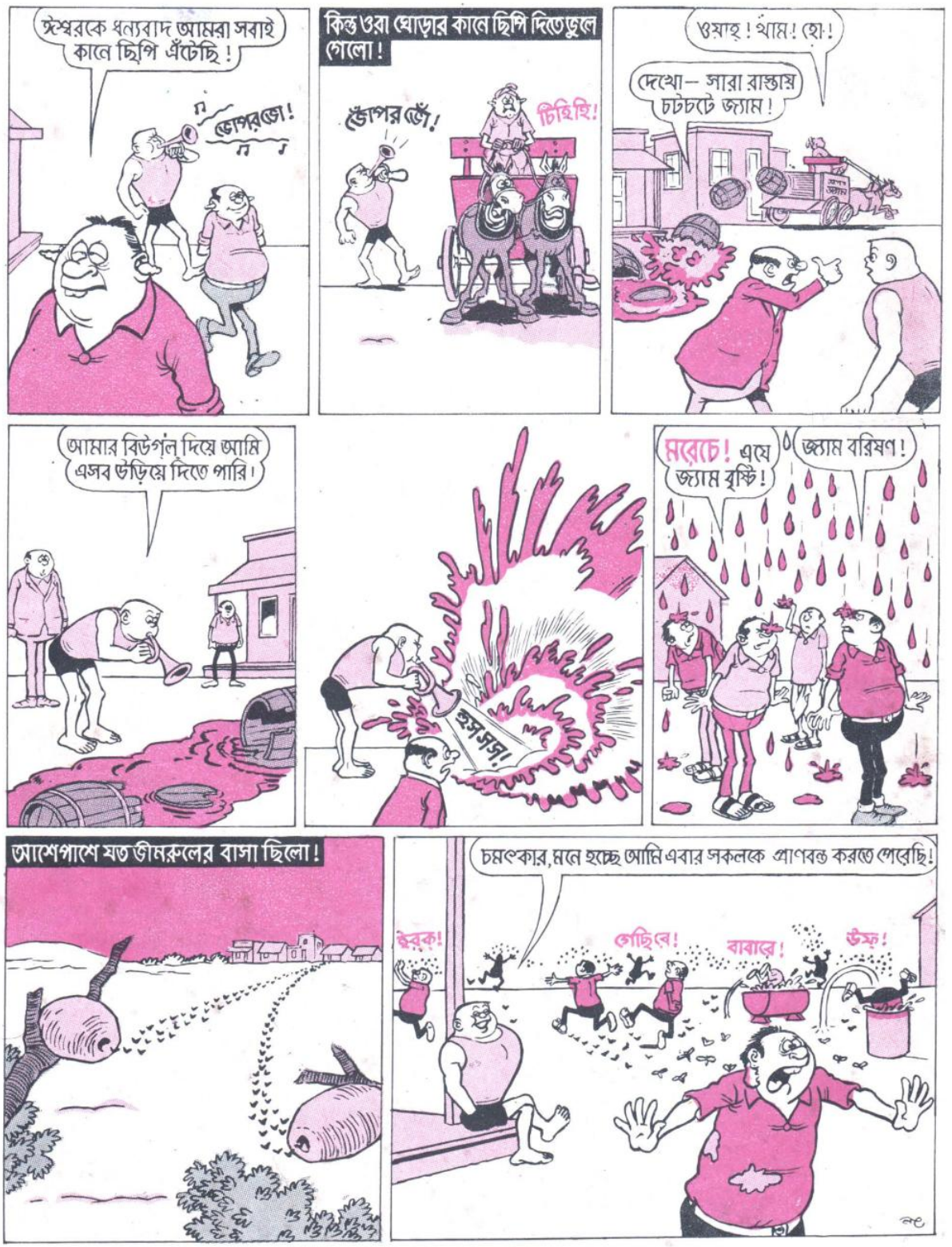

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমরা সবাই কানে ছিপি এঁটেছি !
ভোপরভো!
কিন্তু ওরা ঘোড়ার কানে ছিপি দিতে ভুলে গেলো !
ভোঁপর ভোঁ!
চিহিহি!
ওয়াহ্ ! থাম! হো!
দেখো— সারা রাস্তায় চটচটে জ্যাম !
আমার বিউগ্‌ল দিয়ে আমি এসব উড়িয়ে দিতে পারি।
মরেচে! এযে জ্যাম বৃষ্টি!
জ্যাম বরিষণ!
আশেপাশে যত ভীমরুলের বাসা ছিলো !
চমৎকার, মনে হচ্ছে আমি এবার সকলকে প্রাণবন্ত করতে পেরেছি!
গেছি রে!
বাবারে!
উফ্!

শুকতারা

শ্রাবণ ১৩৯২

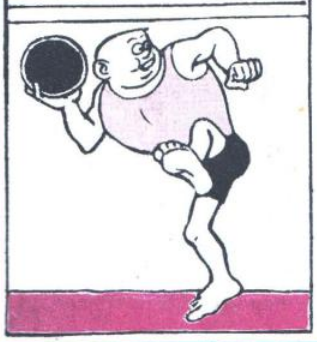

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION, WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 439/1 (2) T. B. C. (Dated 25th January 1982. 2a-2t/81)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক/লেখিকা	পৃষ্ঠা
১। অজানা দ্বীপের বিভীষিকা (ছবিতে গল্প)	নারায়ণ দেবনাথ	প্রচ্ছদ
২। বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন ছবিতে গল্প)	নারায়ণ দেবনাথ	৪০১
৩। দত্তবাবুর নক্সী কাঁথা (কবিতা)	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০৫
৪। রামধনুর সন্ধানে (রঙিন ছবিতে গল্প)	ময়ূখ চৌধুরী	৪০৬
৫। কর্তার সিং সরোভা (অগ্নিযুগের সৈনিক)	সুধীন্দ্রনাথ রাহা	৪০৮
৬। চাষী ও যাদু বোতল (রূপকথা)	গৌতম হাজরা	৪১২
৭। মায়ামৃগ (সত্য কাহিনী)	জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১৬
৮। গুপ্তধনের সন্ধানে (ছবিতে গল্প)	হেমেন্দ্রকুমার রায়	৪২০
৯। পান্ডব গোয়েন্দা (গোয়েন্দা গল্প)	ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়	৪২২
১০। যাদুর দেশে টারজান (অ্যাডভেঞ্চার)	সব্যসাচী	৪৩০
১১। খেলাধূলা	শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৩৫
১২। অলৌকিক (সত্য ঘটনা)	কমল লাহিড়ী	৪৪৭
১৩। রতুর কৃচ্ছ্রসাধন (হাসির গল্প)	প্রণব হোড়	৪৫১
১৪। ছবির মজা	অমল	৪৫৬
১৫। ধূমকেতু আসছে (বিজ্ঞানের গল্প)	আরতি বসু	৪৫৭
১৬। বাজীকরের মৃত্যু (বিদেশী গল্প)	পরাশর রায়	৪৬০
১৭। জল জঙ্গলের দেশে (সুন্দরবনের গল্প)	শচীন দাশ	৪৬৩
১৮। হাঁদা-ভোঁদা (ছবিতে মজার গল্প)	নারায়ণ দেবনাথ	৪৬৬
১৯। গণশার ভুল (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প)	সুজিতকুমার বসাক	৪৬৮
২০। পদ্মপুকুর (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প)	বরদাপ্রসাদ চক্রবর্তী	৪৬৯
২১। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা (ঘোষণা)		৪৭০
২২। মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি)		৪৭১
২৩। দাদুমণির চিঠি		৪৭৩
২৪। তোমাদের পাতা		৪৭৪
২৫। সাহেব বাংলোর ভূত (ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস)	স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৭৬

বি. সি. মজুমদার কর্তক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

গ্রাহক চাঁদা—বার্ষিক—সডাক ৪২ টাকা, ষান্মাসিক—২১ টাকা। মূল্য—টাঃ ৩·৫০

যেদিন আম্মার খোকন দাঁতের গর্ত আবিষ্কার করলো !

ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড

স্বাদ আর ফেনা ওয়ালা এমন টুথপেস্ট যা দাঁত আর মাড়ি দুইই রক্ষা করে!

শুকতারা

৩৮শ বর্ষ ● ৬ষ্ঠ সংখ্যা ● শ্রাবণ, ১৩৯২/জুলাই, ১৯৮৫

দত্তবাবুর নক্সী কাঁথা

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

দত্তবাড়ির সত্যবাবু
মস্তবড়ো দাতা
হাত পাততেই আমায় দিলেন
নোঙরা ছেঁড়া ছাতা।
সেই ছাতাতে যায় না ঢাকা
একজনারও মাথা
দত্ত বলেন, "ছাতা নয় ও
ও যে নক্সী কাঁথা।
দর্জি সাহেব বানিয়ে দিলে
সেমিজটা হাফ হাতা
ওই কাঁথাটাই দিতেন গায়ে
ভিক্টোরিয়ার মাতা।
দু-দুশোটা এ্যাকাউন্টেন্ট্
ভরিয়ে জাব্দা খাতা
খরচ লেখার জন্য আরো
চাইতো সাদা পাতা।

গোলাপ ফুলের পাড়েতে তার
মুক্তো ছিল গাঁথা
মধ্যিখানে ঢেঁস-কুমড়ো
চার কোণেতে আতা!
অ্যামেরিকার বিজ্ঞানীরা
বলতো এ-নয় যা-তা
দেখেই একে নাচ পেয়ে যায়
থৈ তা তা থৈ তা-তা!
ওই কাঁথাতে জড়িয়ে মাথা
পালালে কোলকাতা
দেখবি সবার 'ডিনার রুমে'
তোরই আসন পাতা!!"

ছবি : সুফি

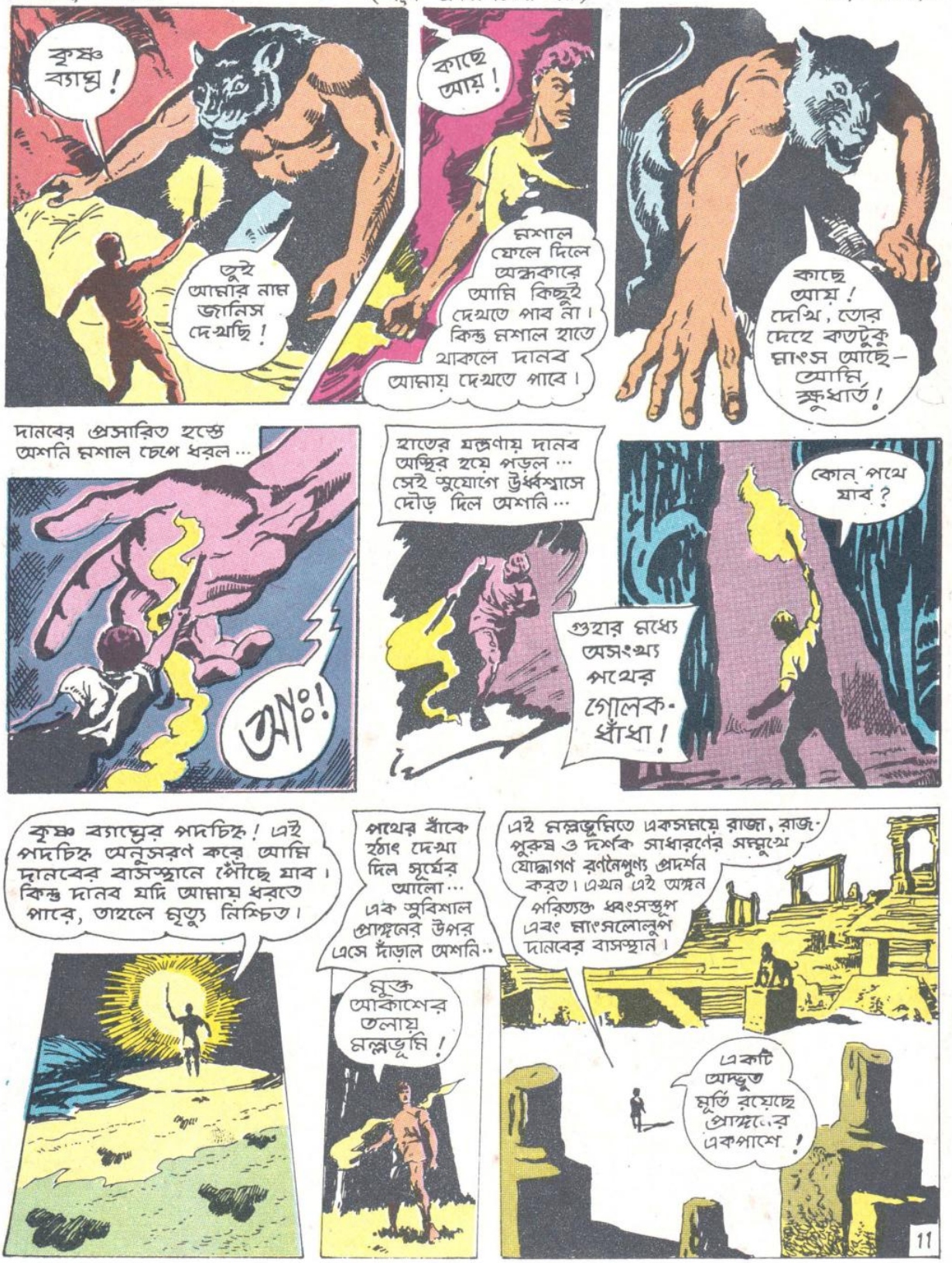
কৃষ্ণ ব্যাঘ্র!
তুই আমার নাগ জানিস দেখছি!
কাছে আয়!
মশাল ফেলে দিলে অন্ধকারে আমি কিছুই দেখতে পাব না। কিন্তু মশাল হাতে থাকলে দানব আমায় দেখতে পাবে।
কাছে আয়! দেখি, তোর দেহে কতটুকু মাংস আছে— আমি ক্ষুধার্ত!
দানবের প্রসারিত হস্তে অশনি মশাল চেপে ধরল...
আঃ!
হাতের যন্ত্রণায় দানব অস্থির হয়ে পড়ল... সেই সুযোগে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল অশনি...
গুহার মধ্যে অসংখ্য পথের গোলক-ধাঁধা!
কোন্ পথে যাব?
কৃষ্ণ ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন! এই পদচিহ্ন অনুসরণ করে আমি দানবের বাসস্থানে পৌঁছে যাব। কিন্তু দানব যদি আমায় ধরতে পারে, তাহলে মৃত্যু নিশ্চিত।
পথের বাঁকে হঠাৎ দেখা দিল সূর্যের আলো... এক সুবিশাল প্রাঙ্গনের উপর এসে দাঁড়াল অশনি..
মুক্ত আকাশের তলায় মল্লভূমি!
এই মল্লভূমিতে একসময়ে রাজা, রাজপুরুষ ও দর্শক সাধারণের সম্মুখে যোদ্ধাগণ রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করত। এখন এই অঙ্গন পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপ এবং মাংসলোলুপ দানবের বাসস্থান।
একটি অদ্ভুত মূর্তি রয়েছে প্রাঙ্গনের একপাশে!

নরব্যাঘ্র-মূর্তির সামনে দুই থাবার মধ্যে একটি কলসের গায়ে লিখিত কথাগুলোর দিকে অশনির দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল ...
নরব্যাঘ্রের মূর্তি! এই মূর্তি বোধ হয় কৃষ্ণ ব্যাঘ্রের পাল্য দেবতা!
কী লেখা আছে ওখানে?... "আমি সেই ব্যাঘ্র, যে ছিল — সেই ব্যাঘ্র থেকে দূরে থাকো, যে রয়েছে — কিন্তু সন্ধান করো সেই ব্যাঘ্রের, যে থাকবে না।" এই সব কথা অর্থহীন!
চারদিকে পড়ে আছে নরকঙ্কাল ও অস্ত্রশস্ত্র। অশনি একটা বর্শা তুলে নিল। কয়েকমুহূর্ত পরেই সুরঙ্গপথ ভেদ করে সগর্জনে আত্মপ্রকাশ করল ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ ব্যাঘ্র!...
হালুম!
আমার পিতার বেদীর উপর আছাড় মেরে তোকে হত্যা করব।
যে-হাতটা মশালের আগুনে পুড়ে গিয়েছিল, কৃষ্ণ ব্যাঘ্র সেই হাতটা মুখে দিয়ে যন্ত্রণা লাঘব করার চেষ্টা করছিল...
অশনি সজোরে বর্শা নিক্ষেপ করল ...
ঐ মূর্তি তাহলে কৃষ্ণ ব্যাঘ্রের পিতার প্রতিচ্ছবি! ... বেশ, পিতার মূর্তির সম্মুখেই পুত্রকে যমালয়ে প্রেরণ করব।
কৃষ্ণ ব্যাঘ্র খুব সহজেই বর্শাটাকে তার দেহ থেকে তুলে ভেঙ্গে ফেলল!...
এই জন্তুটা কি অমর!
ওরে ক্ষুদ্র জীব! আমাকে বধ করার সাধ্য তোর নেই।
আবার গুহায় প্রবেশ করে অন্ধকারে দিশাহারা হয়ে ছুটতে লাগল অশনি... পিছন থেকে ভেসে এল ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ ব্যাঘ্রের ভয়াল গর্জন ...
হঠাৎ!
হুম্‌ম্‌ম্‌!
একী! আরও একটি কৃষ্ণ ব্যাঘ্র!
12

[চলবে]

কর্তার সিং সরোভা

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

ইংরেজ সরকারের উচ্ছেদের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে বহু প্রয়াসই হয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে। এ-সবের ভিতর পাঞ্জাবের প্রচেষ্টাই ব্যাপকতায় ও গভীরতায় অগ্রগণ্য ছিল বলতে হবে। এর শুরু হয় ১৯০৯ সালে। ধীরে ধীরে পরিণতিলাভ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংকটাবহ বৎসরগুলির পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়ে, এবং এর অবসান ঘটে মর্মান্তিক ব্যর্থতার মধ্যে ঐ মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তির আগেই।

আয়োজন চলেছিল তিনটি মহাদেশ জুড়ে। এশিয়ায় ভারত, আফগানিস্তান, জাপান, মালয়; ইউরোপে ইংলন্ড, ফ্রান্স ও জার্মানি; আমেরিকায় কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সর্বত্র গড়ে উঠেছিল ভারতের মুক্তিসমরের কর্মকেন্দ্র। গদর দলের অভ্যুত্থান ও বিলোপ, কোমাগাটামারুর অভিযান ও বজবজের দাঙ্গা, সানফ্রানসিসকোর বিচার-প্রহসন, মালয়ের পঞ্চম পদাতিকবাহিনী ও মালয় স্টেট গাইডবাহিনীর বিদ্রোহ, মান্দালয়ের বিদ্রোহ, এবং দেশের সর্বত্র-ছড়ানো রাজদ্রোহাত্মক ঘটনাবলী, এ সবই ছিল একই জগৎজোড়া কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত কিন্তু অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ১৯১৫-এর পর কয়েক বৎসর ধরে পাঞ্জাবে যে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার তিনটি পর্যায় চলেছিল একটির পরে আর একটি, তার বিচার করতে বসে ধর্মাধিকরণকে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ নিতে হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে।

পাঞ্জাবে যে-আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল ১৯০৯ থেকে, তাতে নতুন করে ইন্ধন জোগাতে লাগল কিস্তি কিস্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সাংহাই ও দূরপ্রাচ্যের অন্যসব দেশ থেকে প্রবাসী ভারতীয়দের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। সারা পৃথিবীর বিপ্লববাদ ও বিপ্লব প্রচেষ্টার বার্তা এঁদের মুখ থেকে শুনতে পেয়ে পাঞ্জাবের মুক্তিকামীরা ক্রমশঃ উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে। প্রবাসীরা শূধু হাতে আসছেন না, লুকিয়ে লুকিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসছেন আগ্নেয়াস্ত্র, টোটা বারুদ ও দেশ-বিদেশের নিষিদ্ধ রাজনীতিমূলক গ্রন্থসমূহ।

পুলিশ কি আর জানে না এসব কথা? জানেও, সন্ধানেও আছে তারা। প্রবাসীরা ভারতের মাটিতে পদার্পণ করা মাত্র পুলিশের চর পিছু নেয় তাদের, লক্ষ্য করে তাদের গতিবিধি, প্রয়োজ বুঝলে অন্তরীণ করে তাদের এমন সব জায়গায় যেখা থেকে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব হবে না তাদের পক্ষে। যে- অল্পসংখ্যক ভাগ্যবা পুলিশের ঐ বেড়াজালের ভিতর থেকে ফসকে বেরি আসতে পারে কোনো উপায়ে, তাদেরই উপদেশে সহযোগিতায় পাঞ্জাবের অসন্তোষের আগুন দাবানলে ন্যায় দিগ্বিদিকে ব্যাপ্ত হতে থাকে দিনের দিন। গ্রা শহরে সর্বস্তরের মানুষকে তো তা তাতিয়ে ক্ষেপি তোলেই, সৈন্যবাহিনীও তার উত্তাপ থেকে রেহা পায় না।

উদ্দেশ্য তাদের মহান, তা তারা জানে। আবার, উদ্দেশ্য সিদ্ধ যদি করতে হয়, দুর্গম মৃত্যুসংকুল পথ দি

যে তাদের পায়ে পায়ে এগুতে হবে, তাও কি তারা জানে না? ঐ কৃষক শ্রমিক বণিক করণিকের দল? বিলক্ষণ জানে তারা। কিন্তু জেনেও ভয় পায়নি। "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য", এই মন্ত্রই তারা নিশিদিন জপ করছে।

সব-চেয়ে কঠিন অংগ কী এই সাধনার? তা হল সৈন্য-বাহিনীকে তাদের ভূয়ো রাজভক্তির মোহ থেকে মুক্ত করে আনা। অথচ তা না করতে পারলে সাফল্যের আশা সুদূরপরাহত। মোহ কেটে বেরিয়ে আসুক ওরা। ওরাই গ্রহণ করুক মুক্তিযুদ্ধের মুখ্য ভূমিকা। সেই তো কর্তব্য তাদের। রণজিৎ সিং গুরু গোবিন্দের মন্ত্রশিষ্য এই পঞ্চনদবাসী বীরেরা কি দেশের শত্রুর জন্যই দেহের রক্ত ঢালতে থাকবে চিরদিন?

সৈন্যদের রাজভক্তিতে চিড় খাওয়ানো হল প্রথম কাজ। দ্বিতীয় কাজ হল অস্ত্রসম্ভার সংগ্রহ করা, বিদেশ থেকে তা আনাবার চেষ্টা চলছে। কিন্তু জার্মানি বল, রুশিয়া বল, কানাডা বল, আনানো সহজ নয় কোনো দেশ থেকেই। সবচেয়ে সুবিধাজনক উপায় হল জলপথে আনানো। কিন্তু এমন কোন সমুদ্র আছে, ইংরেজের যুদ্ধ জাহাজ যেখানে টহল দিচ্ছে না? "Britannia rules the waves," এটা মিথ্যা দম্ভোক্তি নয় ইংরেজদের।

যা হোক, চেষ্টা চলছে সেদিকে। কিন্তু সেই চেষ্টার উপরেই একান্তভাবে নির্ভর করে থাকতে হবে কেন? ভারতের ভিতরেই কি অস্ত্র কম আছে? সে-অস্ত্র ভারতেরই অর্থে ক্রীত। সে-অস্ত্রের ব্যবহারে ভারতবাসী ছাড়া অন্য কারও নৈতিক অধিকার নেই। ঐ অস্ত্র কেড়ে আনতে হবে ইংরেজের অস্ত্রাগার থেকে। সে-কাজ ইংরেজ ফৌজের অংগীভূত ভারতীয় সৈনিকদের পক্ষে সহজ, করাতেও হবে তাদের দিয়েই। আর সৈনিকদের হাতে যা অস্ত্র সচরাচর থাকে, তা তো পাওয়া যাবেই।

অস্ত্রের পরেই যা সর্বাধিক প্রয়োজন, তা হল অর্থ। রাশি রাশি অর্থ, অঢেল অগাধ অর্থ। যুদ্ধের ব্যয়? তা যে কত হবে, তা কোনোদিন কেউ আগে থেকে হিসাব করে বলে উঠতে পারে নি। সুতরাং সুযোগ পেলেই অর্থ সংগ্রহ কর যে কোনো উপায়ে। ছলে বলে কৌশলে। ট্রেজারি লুঠ কর। ধনীর সিন্দুক ভাংগো। পরস্ব অপহরণ নিন্দনীয় বটে। কিন্তু এ ধন তো পরস্ব নয়, ভারতবাসীর নিজস্ব। ওটা যদি গোরার দল নিজেদের ভোগে লাগায় তাদেরই পক্ষে হবে তা পরস্বগ্রাস। বিপ্লবীদের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ও হল একান্তভাবে নিজস্ব।

গোরাদের মনোবল ভেংগে দিতে হবে। এবং গোরাভক্ত কালাদেরও। যাতে বিপ্লব শুরু হওয়ার আগেই তারা ভয়ে আধমরা হয়ে থাকে। ভয় ধরিয়ে দেওয়ার প্রকৃষ্ট উপায় কী? হত্যা ছাড়া আবার কী? বাগে পেলেই কোতল কর। পুলিশকে। মিলিটারিকে। বেসামরিক সাদা আদমিকে। তার ফলে পুলিশের রাজভক্তি টলবে। কৃষ্ণাংগ সিপাহীরা অস্ত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসবে ছাউনি থেকে। সাদার জাতব্যবসা গুটিয়ে শ্বেতদ্বীপে পালাবে রাতারাতি।

বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার আগে রেললাইন উপড়ে ফেলতে হবে, তার কেটে দিতে হবে টেলিগ্রাফের। যাতে উপদ্রুত এলাকায় গোরা সৈনিক পাঠাতে না পারে গবর্নমেন্ট। না পারে আদেশ বা নির্দেশ পাঠাতেও।

সবই করতে হবে। কিন্তু সর্বাগ্রে করতে হবে অস্ত্র সংগ্রহ। বিদেশ থেকে আনানোর বিঘ্ন অনেক। শুধু বিদেশী অস্ত্রের উপরে নির্ভর করেই বিদ্রোহ ঘোষণা করা যায় না। তারপর অস্ত্রাগার লুঠ? সেও তো সুযোগ সাপেক্ষ! তাছাড়া এক জায়গায় যদি লুণ্ঠিত হয় অস্ত্রাগার, অন্য সব জায়গায় সংগে সংগে গোরা সৈনিকের ডবল পাহারা পড়ে যাবে। সবচেয়ে নিরাপদ, সবচেয়ে সুনিশ্চিত পথ হল অস্ত্র নিজেরা গড়ে নেওয়া।

কী অস্ত্র? তরোয়াল? বন্দুক?

তার চেয়েও শক্তিমান অস্ত্রও তো আছে। শক্তিমান এবং সুবিধাজনক। সে-অস্ত্র হল বোমা। একটা টেনিস বলের মতো ছোট্ট বোমার ঘায়ে একটা বাড়ি ভেংগে পড়তে পারে। পকেটে করে নিয়ে যাও, কেউ বিন্দুবিসর্গ জানতে পারবে না যে তোমার পকেটে বিধ্বংসী মারণাস্ত্র আছে একটা। পকেটে নিয়ে চলে যাও শত্রুর একেবারে কাছে। ছুঁড়ে মারো তার মাথায়। ব্যস! খতম!

বোমার সৃষ্টি আগেই হয়েছে বংগদেশে। ১৯০৮ সালেই। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বিপ্লবীদের তীর্থযাত্রা সেই থেকেই চলছে কলকাতার অভিমুখে। বোমার গুরুমহাশয়দের চতুষ্পাঠী সেখানেই কিনা! বিপ্লবীরা গিয়েছেন মহারাষ্ট্র থেকে, গিয়েছেন উত্তর প্রদেশ থেকে, যাচ্ছেন এবার পঞ্চনদ থেকেও। প্রক্রিয়াটি শিখবেন, তারপর প্রয়োজনীয় মালমসলা কিনে নিয়ে ফিরে আসবেন স্বস্থানে।

পঞ্চনদের নানা স্থানে বোমার কর্মশালা স্থাপিত হল ক্রমশঃ। লুধিয়ানা জেলার ঝাবেওয়ালে একটা, নাভা রাজ্যের লোহাৎবোড়িতে একটা। এইরকম কোথায় যে কত, তার লেখাজোখা নেই।

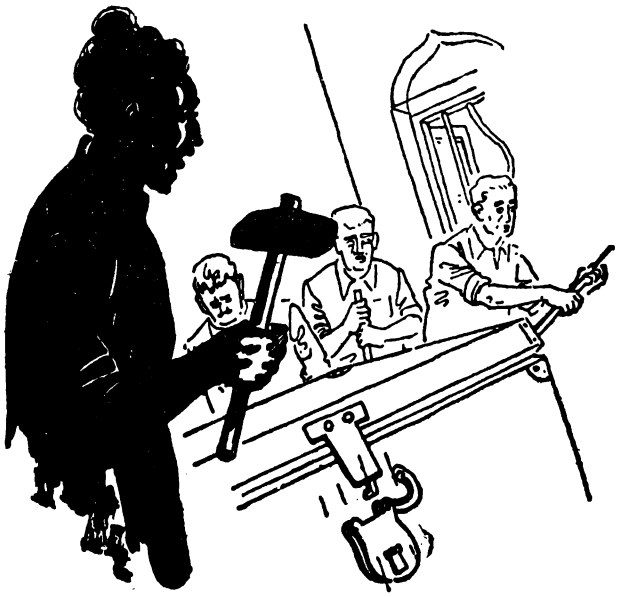

ধনীর সিন্দুক ভাংগো

আগেই বলা হয়েছে, বিপ্লব চিন্তা পাঞ্জাবে শিকড় গেড়েছে সেই ১৯০৯ সালে। তারিখ-হিন্দ (ভারতের ইতিহাস) নাম দিয়ে একটা ধারাবাহিক রচনা ঐ সময়ে ওখানে প্রকাশিত হচ্ছিল কোনো বেনামা প্রেস থেকে। তার মতো রাজদ্রোহাত্মক লেখা পৃথিবীতে অপর কোনো দেশেই কখনো বেরোয় নি। বোমা-নির্মাণ কৌশল ব্যাখ্যা করে একটা ক্ষুদ্র পুস্তিকাও ঐ সময়ে প্রকাশিত হয়।

গদর দলের নির্দেশানুযায়ী বহির্ভারতীয় সৈন্যদলের ভিতর রাজদ্রোহ ছড়াবার চেষ্টা হয়েছিল সাংহাই, হংকং, সিংগাপুর, পেনাং এবং রেংগুনে। এদিকে ভারতের অভ্যন্তরে মিয়ানমির; জলন্ধর, বান্নু, কোহাট, নওশেরা, রাওলপিন্ডি, কাপুরথালা, ফিরোজপুর, মীরাট, কানপুর, আগ্রা, এলাহাবাদ, বেনারস, ফৈজাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আম্বালা, কোনো জায়গার সেনানিবাসে বিদ্রোহের বীজ বপন করতে বাদ রাখে নি বিপ্লবীরা। কোথায় কী ধরনের সংগঠন বর্তমান আছে তাদের, তা এক নজরে বোঝাবার জন্য বিশেষভাবে ছাপানো একধরনের মানচিত্র তারা নিজেদের ভিতর চালু করেছিল।

মীরাটের সেনানিবাসে প্রচার কর্ম চালাতে গিয়ে ধরা পড়ল বিষ্ণু গণেশ পিংলে, ১৯১৫-এর ২৩শে মার্চ তারিখে। ধরা পড়ল, উঁচুদরের বিস্ফোরক বোমা পকেটে নিয়ে। কিন্তু পিংলের সহকারী ছিল যে কর্তার সিং, সে মুক্ত তখনও, গোপনে-ছাপানো 'গদর' পত্রিকা ছাউনিতে ছাউনিতে সে বিলি করে বেড়াচ্ছে বন্ধু হরনাম সিংয়ের সাহায্যে।

তখনকার বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে সর্বপ্রথমে যিনি উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন রাসবিহারী বোস, যাঁকে সবাই জানত 'সতীন্দর চন্দোর' নামে, এবং যাঁর সম্বন্ধে কথা কইতে হলে বলত শুধু 'মোটা বাবু'। অভ্যুত্থানের স্থান, কাল ও কার্যক্রম, সবই এই সতীন্দর চন্দোরের মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়েছিল। সহকর্মী নেতারা ছড়িয়ে আছে পাঞ্জাবে উত্তর প্রদেশের নানা স্থানে, তাদের সব কিছু বুঝিয়ে দেবার জন্য সতীন্দরকে ঝটিকাবেগে ঘুরে বেড়াতে হত সেইসব জায়গায়। তাঁর সহচর সহায়কেরা ডাইনে বাঁয়ে অনবরত গ্রেফতার হচ্ছে, কারারুদ্ধ হচ্ছে, নামমাত্র বিচারের পরে অনেকে হয়ত ফাঁসীতেও ঝুলছে, কিন্তু সদাজাগ্রত সহস্রচক্ষু পুলিশের সাধ্য হচ্ছে না রাসবিহারীকে গ্রেফতার করার। সে এক মহা বিস্ময়।

তোড়জোড় সম্পূর্ণ হয়ে এল। সে-প্রস্তুতিকে অবশ্য সর্বাংগসুন্দর বলে উদ্যোক্তারা কেউই মনে করে নি। কিন্তু অবস্থাগতিকে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া উপায় ছিল না তাদের। আরও ভাল করে তৈরী হব—এমনটা আশা করলে কোনোদিনই যে তৈরী-হওয়ার কাজটা শেষ হবে না, এবিষয়ে কর্মীরা সচেতন ছিল। তাই ১৯১৪ সালের ২৬শে নভেম্বর অভ্যুত্থানের দিন ধার্য করা হল।

ব্যবস্থা হল এইরকম। ঝাড়সাহেব-এ বিপ্লবীদের জমায়েত হবে ঐ তারিখে, একেবারে সশস্ত্র সমাবেশ তেইশ নম্বর অশ্বারোহী সেনাদল এসে যোগ দেবে ঐ জমায়েতে, তারপর মিলিত বিদ্রোহীরা সারাওলি-পট্টি ও ত্রাণতারান অভিমুখে অগ্রসর হবে। লাহোরের বিদ্রোহীরা এসে তাদের সংগে যোগ দেবে এই সময়

২৬শে নভেম্বর এল অবশেষে। ঝাড়সাহেব-এ জমায়েত হল সশস্ত্র বিপ্লবীরা। তারা সারাওলির দিকে মার্চও করল। কিন্তু লাহোর থেকে খবর এল নৈরাশ্যব্যাঞ্জক। সেখানে বিপ্লবীরা অস্ত্রধারণ করে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কী জানি কেন সরাওলি যাত্রীদের সংগে মিলিত হওয়ার কোনো চেষ্টা তারা করল না। পথে পথে খানিকটা আস্ফালন করে তারপর যে যার ডেরায় ফিরে গেল, পুলিশ এসে পড়ার আগেই।

জনা পঁচিশের একটা দল শুধু তা গেল না। এদের নেতৃত্বে ছিল কর্তার সিং, অন্তরংগ মহলে যার ডাকনাম ছিল সরোভা। এই সরোভার সন্দেহ হল। কারও-না-কারও তরফ থেকে গাফিলতি ঘটেছে কর্তব্যে। অথবা

বেইমানিও হতে পারে।

কিন্তু মনের সন্দেহ মনেই চেপে রাখতে বাধ্য সরোভা। নিজের জাঠা ছাড়া অন্য কোনো দলের উপর কর্তৃত্ব তাকে কেউ দেয় নি। অন্য দলকে নির্দেশ দিতে গেলে সেটা হবে সরোভার পক্ষে অনধিকারচর্চা। তখন অন্যের অপেক্ষা না করে নিজের ক্ষুদ্র দলটি নিয়ে সরোভা অকুতোভয়ে এগিয়ে চলল ফিরোজপুরের দিকে। উদ্দেশ্য, পথে মোগায় ট্রেজারি লুঠ করে সারাওলিতে গিয়ে মূল দলের সংগে মিলিত হবে।

গোড়ায় কিন্তু কর্মসূচি এইকরম ছিল যে মোগার ট্রেজারি লুঠ করতে লাহোরী বিপ্লবীদের গোটা দলটাই আত্মনিয়োগ করবে। সে-ট্রেজারিতে পুরো একডজন বন্দুকধারী পাহারা থাকে চব্বিশ ঘন্টা। বিপ্লবীদের বোমা আছে, বন্দুক নেই। সুতরাং যুদ্ধ যদি হয়, সেটা হবে অসম যুদ্ধ। বোমা তো দু'শো গজ দূর থেকে ছোঁড়া যায় না! রাইফেল কিন্তু যায়!

তবু কর্তার সিং সরোভা দমল না! বেইমানি আর যেই করে থাকুক, সে করবে না। মোটাবাবু যে-কাজের ভার লাহোরীদের উপর দিয়ে রেখেছেন, সেও যখন লাহোরী, সে তা জীবন দিয়েও সমাধা করবে। পরিস্থিতিটা যে কী সংকটের, তা সে গোপন করল নিজের দলের লোকেদের কাছে। সব বুঝিয়ে বলে তার পর সে হাঁকল, "সব জেনে-শুনেও যারা আমার সংগে যেতে চাও, এসো। বাকী সবাই বাড়ি ফিরে যেতে পার।"

কর্তার সিং সরোভার সংগে গেল তেরোজন। তাকে নিয়ে চৌদ্দজন মোট। এই চৌদ্দজনই অগ্রসর হল মোগার দিকে। সম্বল—ছয়টা বোমা, দু'টো রাইফেল, খানকতক ভোজালি।

মোগাতে সংঘর্ষ হল। অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ট্রেজারির প্রহরীদলকে বেশ কায়দায় এনেছিল কর্তার সিং, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। হবে যে, তা অবশ্য সে আশাও করে নি। বারোজন প্রহরীর মধ্যে দশজনই হতাহত হল বোমা ও বন্দুকে। কিন্তু কর্তার সিং নিজে এবং তার সংগীদের মধ্যে আটজন হল সাংঘাতিক আহত। পালাবার মতো অবস্থা তাদের ছিল না। ধরা পড়ল।

বিচারের সময় সে শুধু একটি কথা বলেছিল—"যা হুকুম ছিল, তাই করেছি। বেইমানি করি নি।"

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসী হয়েছিল সাতজনের। কর্তার সিং তাদের মধ্যে একজন। ১৯১৫ সালের ১৭ই নভেম্বর লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসী হয়ে গেল তাদের।

দেব সাহিত্য কুটীরের
নবতম উপহার
ক্রাইম সিরিজ
রহস্য, রোমাঞ্চ, সন্ত্রাস, গুপ্তচর আর গোয়েন্দা কাহিনী নিয়ে রুদ্ধশ্বাস উপন্যাস। প্রতি মাসে একটি করে বেরুবে। প্রত্যেকটি বইয়ের দাম মাত্র সাত টাকা।
লিখছেন বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক
ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

১ বৈশাখ বেরিয়েছে
বুলেটের শিস্
আমেদের পিঠের ওপর একটা ছোরা আমূল গেঁথে আছে। শূন্য ঘর। আততায়ী কি ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে আছে.....ঠিক তখনই সাইলেনসার দেওয়া পি থার্টি এইট থেকে একটি শব্দ সৃ...ঈ...শ্‌শ্‌...।

১ জ্যৈষ্ঠ বেরিয়েছে
উজ্জ্বল নীল মৃত্যু

চারজনে মিলে ঠিক করলো, এসো আমরা খুন, জখম, রাহাজানি, ব্যাংক ডাকাতি করে বেড়াই। তারপর...শুরু হলো এক দুঃস্বপ্নের মিছিল—যা দেখে শিউরে উঠতে হবে বারবার।

১ আষাঢ় বেরিয়েছে
উড়ন্ত বাজ
ঝকঝকে তাজা রক্তের মতো লাল একটা গাড়ি ছুটিয়ে ওরা এলো....স্লিক...ফুটপাথের ওপর ছিটকে পড়ল একটি লোকের মাথা। মুণ্ডহীন লাশ ছটফট করতে করতে নেতিয়ে পড়ল.....

১ শ্রাবণ বেরিয়েছে
জ্বলন্ত আগুন

মিউনিখ থেকে ভিয়েনা আসছে সাসিট এক্সপ্রেস, ভেতরে চার রাষ্ট্রনায়ক। তাঁদের খুন করবে জনৈক দেহরক্ষী। ঘাতক সংস্থার নেতৃত্ব দিচ্ছেন পদ্মনাভন। এর আগেই এক ভারতীয় এজেন্ট খুন হয়ে গেলেন ব্যাভারিয়ার নির্জন হ্রদে—তারই তদন্ত করতে গিয়ে আর এক ভারতীয় অফিসার বারবার মৃত্যুর সংগে পাঞ্জা কষলেন। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের এক নৃশংস দৃশ্যপট।

দেব সাহিত্য কুটীর : ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

চাষী ও যাদু বোতল

গৌতম হাজরা

অনেকদিন আগেকার কথা। এদেশের কোনো এক গ্রামে এক চাষী ও চাষী-বৌ বাস করতো। চাষী খুব গরীব। সে জনমজুর খেটে কোনো রকমে দিন যাপন করতো।

একবার দেশে খুব আকাল হলো। আকাশে মেঘ নেই, জলের অভাবে চাষের মাঠ ফুটিফাটা। চাষ-আবাদ নেই– কাজকর্ম সব বন্ধ। চতুর্দিকে হাহাকার। চাষী আর চাষী-বৌ-এর নিদারুণ কষ্টে দিন চলতে লাগলো।

দিন আর চলে না। আজ ঘটিটা, কাল বাটিটা, ঘরে যা ছিল একে একে তাও বিক্রি হয়ে গেল। শেষে আর দিন চলে না। এই দেখে চাষী-বৌ চাষীকে বললো, দেখ আমাদের তো এই হাল। ঘরে থাকবার মধ্যে আছে আমাদের লক্ষ্মী গাই। তাকেও যে দু'এক গোছা খড় খেতে দেব–তাও সামর্থ্য নেই। কী হবে আর মিছে মায়া বাড়িয়ে–তার থেকে ওটাকে বরং হাটে বিক্রি করে দাও।

অন্য উপায় না দেখে চাষী গরু নিয়ে হাটে চললো।

মাঝপথে এক থুত্থুরে বুড়োর সঙ্গে চাষীর দেখা। বুড়োর মাথার চুলগুলো সব পেকে সাদা। এক মুখ লম্বা সাদা দাড়ি। পরনে যাদুকরের মতো আলখাল্লা পোশাক। হাতে তার অদ্ভুত লম্বাটে ধরনের একটি বোতল।

বুড়োটি চাষীকে বললো, গরু নিয়ে কোথায় চললে হে ?

চাষী বললো, হাটে, বিক্রি করতে।

বুড়ো অবাক হয়ে বললো, বল কী ! এমন জিনিস তুমি বিক্রি করবে !

চাষী তার দুঃখের কথা বুড়োকে সব বললো। তারপর বললো, কপালের ফের, না হলে কি আর এমন হয়। দেশজোড়া আকাল। নিজেই খেতে পাই না তো বোবা পশুটাকে খাওয়াবো কেমন করে। তবু যদি পশুটা কোনো ভালো লোকের হাতে পড়ে, তাহলে খেয়ে তো বাঁচবে। আর আমিও দুটো পয়সা পাবো।

বুড়ো বললো, তবে আর হাটে যাবে কেন। দাও, গরু আমিই কিনবো।

চাষী তো খুব খুশি। ভাবলো, হাতের কাছেই যখন ক্রেতা পাওয়া গেছে তখন হাটে যাবার দরকারই বা কী! তাই চাষী বুড়োকে বললো, বেশ, তুমি যখন চাইছো তখন তুমিই নাও। কিন্তু কী দাম দেবে?

বুড়ো বললো, টাকাপয়সার কারবার আমার নেই ভাই। আমি এই বোতলটা তোমাকে দিতে পারি–বলে হাতের বোতলটা তুলে দেখালো।

চাষী বিরক্ত হয়ে বললো, একটা গাই-এর বদলে একটা বোতল। তাও আবার খালি! দরকার নেই আমার খালি বোতলে। আমি গরীব বলে তুমি এই উপহাস করলে। এখন পথ ছাড়, আমি হাটে যাই।

বুড়ো হেসে বললো, আহা, রাগ করছো কেন? বোতলটা তো নাও–তারপর না হয় এর গুণাগুণ বুঝো।

চাষী এতেও খুশি হতে পারলো না। বললো, বটে, তুমি কি বলতে চাও তোমার ঐ খালি বোতল উপুড় করলেই টাকাপয়সা গড়িয়ে পড়বে?

বুড়ো বললো, তা নয়। আগেই তো বলেছি, টাকা-পয়সার কারবার আমার নেই। ও জিনিস থাকার থেকে না থাকাই ভালো। যত অনর্থ তো টাকাপয়সাতেই। থাকলে তো হারাবেই, উপরন্তু আবার চোর-ডাকাতেও হাত বাড়ায়। তা-ছাড়া নগদ টাকাপয়সা ক'দিনই বা থাকে বলো? শেষ পর্যন্ত অবস্থা যে কে সেই। কিন্তু আমার বোতলে কোনো ঠকামি নেই। ভয় নেই, খরচ করলেও ক্ষয় নেই। কেবল প্রয়োজনের সময় বোতলটাকে মেঝের ওপর এমনি করে বসাবে। তারপর মুখের ছিপি খুলে দিয়ে বলবে–বোতল, তোমার কাজ কী? ব্যস, দেখতে পাবে বোতল তার কাজ ঠিক করে যাচ্ছে। বুঝলে তো, এই জাদু বোতলের কি গুণাগুণ।

চাষী বললো, আশ্চর্য তো! ঠিক আছে। তোমার বোতলটা তবে দাও। কিন্তু তুমি ঠকাচ্ছ না তো?

বুড়ো বললো, বিশ্বাসই হচ্ছে আসল। তুমি এটা বাড়িতে নিয়ে যাও। তখন বুঝতে পারবে সত্যি না মিথ্যে। তবে হ্যাঁ, এই বোতল নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতে যেও না কখনো। নেহাৎ প্রয়োজন হলেই বোতলকে তুমি কাজে লাগাবে, নচেৎ নয়। জানো তো, বেশি লোভ ভালো নয়।

চাষী আর দ্বিরুক্তি না করে গরুর বিনিময়ে বোতল নিয়ে বাড়ির পথ ধরলো।

চাষীকে এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে দেখে চাষী-বৌ তো অবাক! জিজ্ঞাসা করলো, হাটে যাও নি বুঝি? গাইটাকে তাহলে কোথায় রেখে এলে?

একটা জলজ্যান্ত গাই-এর বদলে একটা খালি বোতল!

–হাটে আর যেতে হলো না বৌ, পথেই কাজ হয়ে গেল।

এই বলে চাষী-বৌ-এর হাতে বোতলটা দিয়ে চাষী সব কথা খুলে বললো।

সব শুনে চাষী-বৌ তো রেগে আগুন। বললো, হায় আমার পোড়া কপাল। এই তোমার বুদ্ধি! একটা জলজ্যান্ত গাই-এর বদলে একটা খালি বোতল।

চাষী বললো, এত রাগ করছো কেন? আমি কি এতই বোকা? এ বোতল যে সে বোতল নয়–এ যাদু বোতল। এর কান্ড দেখলে তুমি থ হয়ে যাবে।

এই বলে চাষী মেঝের ওপর বোতলটা বসালো। তারপর বোতলের মুখের ছিপি খুলে বললো, বোতল, তোমার কাজ কী?

অবাক কান্ড! বলা মাত্র ঘরের ভেতরটা যেন নিঃঝুম হয়ে গেল। চারিদিক থমথমে। চাষী-বৌ-এর তো অজ্ঞান হবার অবস্থা। এ কী তাজ্জব কান্ড! ঐ ছোট্ট বোতলটার ভেতর থেকে বের হয়ে এলো একটা অদ্ভুত আকৃতির বামন–হাতে তার বিরাট সোনার থালা, তাতে নানা রকমের খাবার। থালাটি সামনে রেখেই বামনটি ধোঁয়ার আকারে বোতলের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কান্ড দেখে চাষী-বৌ তো অবাক! মুখে রা নেই, বেচারির চোখ ছানাবড়া। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে রইলো বোতলের দিকে।

চাষী তখন বোতলের ছিপিটা বন্ধ করে বললো, দেখলে তো। বোতলের কান্ড। এখন এসো, খাবারগুলো খেয়ে পেট ভরানো যাক।

অনেকদিন পরে দুজনে পেটভরে খেল।

খাওয়া তো হলো, এবার টাকাপয়সাও তো দরকার। ঘরে তো কিছুই নেই। চাষী সোনার থালা নিয়ে গেল শহরে। সেখানে সোনার থালা বেচে অনেক টাকা পেল।

এইভাবে ধীরে ধীরে যাদু বোতলের দৌলতে চাষী ও চাষী-বৌ-এর অবস্থা ফিরলো।

চাষীর মনে অনেক আশা। একদিন সে শহরে গিয়ে সোনার থালা বেচে এক জুড়ি গাড়ি কিনে ফেললো।

চাষী-বৌ তো অবাক! চাষী যেন বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করছে। বৌ-এর মনের ভাব বুঝে চাষী আগে-ভাগেই বলে উঠলো, তুমি কিছু ভেব না বৌ। ভেবে দেখ, ভোগ করা যখন আমাদের ভাগ্যে জুটেছে তখন একটু শখ করেই নিই। তাছাড়া ভোগ না করলে ধন-দৌলতের মূল্যই বা কী?

কিন্তু এই জুড়ি গাড়িই কাল হলো শেষে। চাষীর হঠাৎ বড়লোক হওয়ার কথা জমিদারের কানে আগেই উঠেছিল। ব্যাপারটা খুব ভালো ঠেকেনি। আবার চোখের ওপর জুড়ি গাড়ি হাঁকাতে দেখে জমিদারের হিংসা আরও বাড়লো। একটা চাষী জুড়ি গাড়ি হাঁকাবে, এ কি সহ্য করা যায়।

জমিদারের কারসাজিতে চারিদিকে চাষীর বদনাম রটে

ভয়ে চিৎকার করে উঠলো চাষী-বৌ।

গেল–চাষী চোর। শুধু চোর নয়–চোরের সর্দার। চুরির ধনে ভাগ বসিয়ে হঠাৎ সে বড়লোক হয়েছে। নালিশও হলো জমিদারের দরবারে। জমিদার পেয়াদা পাঠিয়ে চাষীকে চোরের মত বেঁধে আনলেন।

চাষী-বৌ জমিদারের পায়ে পড়ে কান্নাকাটি করলো চাষীকে ছেড়ে দেবার জন্য। নানাভাবে বলতে লাগলো চাষী চোর নয়। চাষী-বৌ-এর কথা জমিদার কানেই তুললেন না। চোর না হলে চাষীর হাতে এত ধন-দৌলত আসে কোথা থেকে? চাষী-বৌ নিরুপায়। কোনো প্রকারেই সুবিধে করতে না পেরে অবশেষে সে যাদু বোতলের গোপন খবরটা জমিদারের কাছে ফাঁস করে দিল।

জমিদার তখন চাষীকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু বিচারের নামে তার গাড়িখানা ভেঙে দিলেন, জুড়ি ঘোড়া কেড়ে নিলেন, সোনা-দানা এবং সেই সঙ্গে যাদু বোতলটা বাজেয়াপ্ত করে দিলেন।

চাষী আর চাষী-বৌ আবার কষ্টে পড়লো। গতর খাটিয়ে রুজি-রোজগার করবে সে উপায়ও আর নেই। কারণ অনেকদিন আরামে থাকার ফলে সে ক্ষমতাও চলে গেছে। ঘরের জিনিসপত্র যা কিছু ছিল তাও বিক্রি হয়ে গেল। আর কিছু নেই। তখন চাষী-বৌ-এর কথায় চাষী আবার ভাঙা গাড়িটাকেই ঠেলে নিয়ে চললো হাটে।

হাটের পথে সেই পুরানো জায়গায় এসে চাষী থমকিয়ে দাঁড়ালো। সেই বুড়ো আজও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

বুড়ো জিজ্ঞাসা করলো, ভাঙা গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলেছ তুমি কি হে? চেনা চেনা লাগছে যেন। এ কি সেই তুমি! তোমার এ দুরবস্থা কেন ভায়া!

চাষী দুঃখের কথা সব খুলে বললো।

বুড়ো বললো, তোমাকে আগেই বলে দিয়েছিলাম–বেশি বাড়াবাড়ি কোর না। বলেছিলাম নেহাৎ প্রয়োজন না হলে বোতলের সাহায্য নেবে না। তোমাকে সরল ভেবে বোতলটি দিয়েছিলাম। তুমি সরল মনে আমার বোতলটি নিলে, কিন্তু কই বুদ্ধিটা তো নিলে না। যাই হোক, তোমায় আর একখানা বোতল দিচ্ছি। এবার এই বোতলটা নিয়ে তোমার ভাঙা গাড়িখানা আমাকে দিয়ে যাও। এ বোতলের সাহায্যে তোমার হারানো জাদু বোতল ফিরে পাবে। কিন্তু সাবধান, বেচাল হয়ো না।

চাষী বোতল নিয়ে বাড়ি ফিরে বৌকে সব খুলে বললো।

বোতলের কাজ তাদের জানাই ছিল। চাষী-বৌ মেঝেতে বোতলটি যথারীতি বসিয়ে হুকুম করতেই–এ কি কান্ড! বোতল থেকে দুই বিরাট আকারের দৈত্য বের হয়ে এলো–হাতে প্রকান্ড লাঠি। মুহূর্তে মারমুখী হয়ে দৈত্য দুটি দাপাদাপি শুরু করে দিল। ঘরের জিনিসপত্র সব ভেঙে তছনছ করে দিল।

ভয়ে চিৎকার করে উঠলো চাষী-বৌ। চাষী বেগতিক দেখে হুংকার দিয়ে বললো, থামো, এবার থামো।

বলা মাত্র দুই দানব বোতলের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। চাষী সঙ্গে সঙ্গে বোতলের মুখ শক্ত করে আটকে দিয়ে কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে রইলো। তারপর কি মনে করে গামছা দিয়ে বোতলটি মুড়ে জমিদারের বাড়ির দিকে চললো।

সেদিন জমিদার-বাড়িতে ছিল আমোদ স্ফূর্তির বিরাট ঘটা। অনেক বণিক, সওদাগর, জ্ঞানীগুণী, ধনী-মানী অতিথির নিমন্ত্রণ হয়েছিল। জমিদার সকলের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ও গল্পগুজব করছিল। চাষী আবার এক যাদু বোতল নিয়ে এসেছে, এই কথা শোনা মাত্র সেখানেই তাকে ডেকে পাঠালো।

চাষী সভাঘরে পা দিয়েই থতমত খেল। তারপর মাথা নিচু করে জমিদারকে অভিবাদন জানালো। বোতলটি মেঝেতে নামিয়ে রেখে বললো, হুজুর, এ বোতলের গুণ আমার আগের বোতলের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু আমার ভাগ্যে এ রাখা চলবে না। তাই বিক্রি করতে চাই।

জমিদার বললো, বেশ তো। তাহলে সকলের সামনে তোমার বোতলের গুণ পরীক্ষা হোক। সকলকে খুশি করতে পারলেই আমি বোতল কিনব। যা ন্যায্য দাম, তার চেয়েও বেশি দাম তোমাকে দেব।

চাষী তো এই সুযোগই খুঁজছিল। সে চটপট বোতলের মুখ খুলে দিয়ে বললো, বোতল, তোমার কাজ কী?

যেই না বলা–আর যায় কোথায়? সেই দুই দৈত্য–হাতে প্রকান্ড লাঠি–মারমুখী হয়ে বণিক, সওদাগর, জমিদার সকলের উপর চড়াও হলো। দাপাদাপি, দুমদাম, এলোপাথাড়ি মার আর চিৎকার। সব লন্ডভন্ড ওলট-পালট। মারের চোটে যে যেদিকে পারলো ছুট লাগালো।

এই সুযোগে চাষী আগের বোতলটি খুঁজে বের করে নতুন বোতলকে থামিয়ে নিঃশব্দে জমিদার বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

তারপর! তারপর আর কী?

চাষী আর চাষী-বৌ-এর আর কোনো দুঃখ রইলো না। অভাবে, আপদে-বিপদে দুই যাদু বোতল তাদের সম্বল হয়ে রইলো।

ছবি: দিলীপ দাশ

মায়ামৃগ

জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবতাত্মা হিমালয়। এর এমন অসংখ্য গিরিশৃংগ আছে যেখানে যুগ যুগ ধরে জীবিত প্রাণীর পদার্পণ ঘটেনি বা কোনো পর্বতযাত্রী পৌঁছতে পারেনি আজও।

স্থানীয় লোকগাথা-উপকথা-কিংবদন্তি আর জনশ্রুতিতে আছে এমন অনেক দুর্লঙ্ঘ্য গিরিচূড়া ও দুর্গম পর্বতগুহার কথা যেখানে গেলে নাকি রামায়ণ মহাভারতের যুগের প্রাচীন মুনি-ঋষি ও সন্ন্যাসীদের সমসাময়িক দু'চারজন সাধুসন্ত বা তাপসের দেখা পাওয়া যাবে এখনও। তাঁরা সে-সব নির্জন স্থানে গভীর ধ্যান-ধারণা ও তপস্যায় নিমগ্ন। জীবের কল্যাণ, আত্মা ও পরমাত্মার উপলব্ধি ও মানবের মংগলই তাঁদের চরম লক্ষ্য। সম্ভবত হাজার হাজার বছর আগেকার সেই প্রাগৈতিহাসিক কিংবা পৌরাণিক কাল থেকেই তাঁরা সেখানে অবস্থান করছেন। তাঁরা সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানরহিত জৈবিক প্রয়োজনমুক্ত ও বহির্জগতের সংগে সম্পর্কশূন্য। কেউ কেউ নাকি জমাটবাঁধা বরফের স্তূপে জীবন্ত সমাধিতে স্থিত।

কখনো সখনো কালে ভদ্রে দৈবাৎ এঁদের দু'একজনের দেখাও নাকি পেয়েছে কেউ কেউ। তাদের বলা বিবরণকে একেবারে উদ্ভট কাহিনী, গুজব কিংবা পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আজকের বিজ্ঞানও বরফজমাট হয়ে, এমন এক অপরিবর্তিত স্তরে জীবের দীর্ঘকাল, সম্ভবত অনন্তকাল, সপ্রাণ অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে স্বীকার করছে। একে বলছে 'সাসপেন্ডেড লাইফ' বা প্রলম্বিত জীবন।

এই প্রসংগে আজকে যে কাহিনীটি বলতে যাচ্ছি সেটা আপাতত অবিশ্বাস্য হলেও সম্পূর্ণ সত্যি ঘটনা। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

হিমালয়ের যে অঞ্চলটায় গংগোত্রী হিমবাহ হতে উৎপন্ন হয়ে গংগা ক্রমে সমতলভূমির দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে সেই সরু অথচ তীব্র বেগবতী তরংগধারার মুখের কাছে পার্বত্য অঞ্চলে এমন কয়েকটা গিরিপথ আছে যেগুলো সামরিক দিক দিয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই সব জায়গাগুলো সাধারণত সারা বছরই প্রায় তুষারাচ্ছন্ন থাকে, তাই সৈন্যদের চলাফেরা এখানে অসম্ভব না হলেও বেশ কষ্টকর।

এ অঞ্চলে কড়া সামরিক নজরদারি ছাড়াও আছে ভারতীয় পুলিশবাহিনী থেকে বাছাই করে নিযুক্ত করা গোয়েন্দা সংস্থার অফিসারেরা। কাছাকাছির পার্বত্য গ্রামগুলি এদের আবাসস্থল ও ক্রিয়াকর্মের ঘাঁটি।

ঘটনাচক্রে মানা গিরিবর্ত্মের কাছে একটি ছোট গ্রামে আমাকে কিছুদিন বাস করতে হয়েছিল চাকুরি সূত্রে।

এক সন্ধ্যায় আমি যথারীতি রোঁদে বেরিয়েছি দুজন সশস্ত্র স্থানীয় দেহাতী অনুচর সংগে নিয়ে। নিজেও, বলা বাহুল্য আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত।

আমরা এগিয়ে চলেছি গংগার উপলবন্ধুর দক্ষিণ তীরভূমি ধরে। আশপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অতীব মনোরম। এ যেন স্বর্গের নন্দনকানন। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না সে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দুচোখ ভরে দেখছি হিমালয়ের এই অপার্থিব রূপ। দেখতে দেখতে তন্ময়, কতকটা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলাম।

সংবিৎ ফিরল আচমকা সংগীদের একজনের ইংগিতে। ইশারায় হাত তুলে সে দেখালো সামনের খাড়া পাহাড়ের উঁচু দিকটা। আমরা তিনজনেই দেখলাম এক অতি অদ্ভুত মনোমুগ্ধকর দৃশ্য সেখানে। অদূরবর্তী প্রায় খাড়া উঁচু পাহাড়টার গা বেয়ে লাফাতে লাফাতে আরো উঁচুতে উঠে যাচ্ছে একটা ভারি সুন্দর হরিণছানা।

সংগের দেহাতী দুজনের একজন যে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করে এটা ও আমাদের ডেকে দেখায়, বলল—আরে, ঐ দেখুন হুজুর হরিণ ছানাটা যে পালিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ওটা কস্তুরী মৃগ। এখানেই তো ঐ জাতের হরিণের দেখা মেলে। যা দাম কস্তুরীর এখন, ধরতে পারলে বড়লোক। লোভে চকচক করে উঠল দেহাতীটার দু'চোখ। অন্যজন

মাথা নেড়ে সায় দিল একথায়। আমরা তিনজনে মিলে একদৃষ্টে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলাম হরিণছানাটিকে। লাফিয়ে লাফিয়ে সেটা ততক্ষণে আরো অনেকটা উঁচুতে উঠে গেছে। খাড়া পাহাড়ের গায়ে বেরিয়ে থাকা পাথরের চাঁইয়ের এক কার্নিশ থেকে আর এক কার্নিশে যখন ওটা উঠছিল তখন কী অদ্ভুত সুন্দরই না লাগছিল দেখতে ওর চলার ছন্দ। ওর ছিপছিপে ছিমছাম শরীরের বিচিত্র বর্ণবাহার, ওর মসৃণ দেহে পেশীর হিল্লোল, ঝলসে ঝলসে উঠছিল তুষারময় গিরিশৃংগে প্রতিফলিত সূর্যের শেষ স্বর্ণাভ রশ্মিরেখায়। মনে হলো এ ছবি এ জগতের নয়, ইন্দ্রলোকের–অমর সৌন্দর্যের অলকাপুরীর কোনো চঞ্চল প্রাচীরচিত্র।

প্রথম দেহাতীটা বলল–ইয়ে হামকো জরুর মিলনা–এটাকে পেতেই হবে। এই বলে তার হাতের বন্দুক তুলল। আমি জানতুম লোকটার হাতের টিপ অব্যর্থ। ওস্তাদ বন্দুকবাজ বলে ওর বেশ নামডাক আছে এ তল্লাটে। ও যদি হরিণটাকে তাক করে গুলি ছোঁড়ে তবে তা না ফসকাবারই কথা। আমি তাড়াতাড়ি ধাতস্থ হয়ে সভয়ে ওর হাতের কনুইয়ে টান দিয়ে ওকে একাজ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলাম। বললাম–আরে, এ ক্যা করতে হো তুম, বেওকুফ। উসকো গোলী মাৎ করো, উতারো বন্দুক। দেখতে নেইহি কিতনা খুবসুরৎ উয়হ্, খুদ কিষেণ ভাগওয়ানজীকা জীও হ্যায়।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। লোকটার মাথায় যেন খুন চেপে গেছে। ওর জেদ, যে করে হোক, হরিণটিকে মেরে ফেলতেই হবে। আর তাছাড়া আমারও ওকে বাধা দিতে বেশ খানিক দেরি হয়ে গেছে অন্যমনস্কতার দরুন তার আগেই ওর ট্রিগার টানা সারা। এসব কাজে ক্ষিপ্রতায় এদের জুড়ি নেই।

কানে এল রাইফেলের কান-ফাটানো আওয়াজ। সেই সংগে আশা করেছিলাম আহত হরিণ শিশুটির দিক থেকে ঈষৎ আর্তনাদ ও পতনধ্বনি। কিন্তু তার বদলে যা কানে এল তা বর্ণনা করবার ভাষা নেই আমার। পশুর বদলে মানুষের গলার কাতর বেদনার্ত কণ্ঠস্বর। কোনো বয়স্ক প্রবীণ ব্যক্তির গলার তীব্র যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি।

আমরা তিনজনেই এই আকস্মিক পরিস্থিতিতে যারপরনাই আতঙ্কিত, স্তম্ভিত। বিমূঢ় নির্বাক ছবিতে আমরা একবার ঘটনাস্থল, একবার পরস্পরের মুখ অবলোকন করলাম। এ কী হলো! এ কোন বিপত্তি। না কোনো মারাত্মক ভুলভ্রান্তি বা দুর্ঘটনা এ। হরিণ মারতে গিয়ে অন্য কারো গায়ে গুলি লাগল কি! তাই বা কী করে হবে! তিন তিনজনেই স্পষ্ট দেখেছি ওটা হরিণই ছিল এবং গুলি খেয়ে যে ওটা ছটফটিয়ে গড়িয়ে পড়ছে নিচে তা দেখেছি তিনজনেই।

বিস্ময়ের ঘোর কিছুটা কাটলে তিনজনেই প্রায় হামাগুড়ি দিতে দিতে এগুলাম সেই উঁচু জায়গাটার কাছে।

আমরা যত এগিয়ে আসছি ওখানটার কাছাকাছি ততই আরো বেশি স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্ছি সেই যন্ত্রণাকাতর গোঙানির আওয়াজ।

যে দেহাতীটা গুলি ছুঁড়েছিল তার সারা শরীর যেন প্রবলবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। শীতে? না তাও তো নয়। তবে?

অবশেষে ঘটনাস্থলে পৌঁছলাম। যা দেখলাম তাতে আমাদের আর বাকস্ফূর্তি নেই কারো।

কোথায় হরিণ, কোথায় কী! ত্রিসীমানাতেও নেই কোনো হরিণের চিহ্ন। তার বদলে সামনে অদূরে

রক্তাক্ত দেহে যন্ত্রণায় ছটফট করছে এক অতি প্রাচীন বৃদ্ধ।

পাথরের উপর পড়ে রক্তাক্ত দেহে যন্ত্রণায় ছটফট করছে এক অতি প্রাচীন বৃদ্ধ দু'হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে। বুকের ঠিক মাঝখানে বুলেটের ক্ষত। আর তা থেকে অজস্র ধারায় বেরিয়ে জায়গাটা ভাসিয়ে দিচ্ছে তাজা টাটকা রক্ত। শুভ্র তুষারের বুকে অজানা কোনো বিপদের আশঙ্কার তথা মানুষের আদিম জিঘাংসার প্রতি নিষেধাজ্ঞার নিশান ও চরম হুঁশিয়ারি প্রতীক হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে অপাপবিদ্ধ অতি প্রাচীন এক অহিংস বৃদ্ধর উজ্জ্বল দেহরক্ত।

আমরা তিনজনেই ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি তুলে নিতে গেলাম আহত বৃদ্ধের দেহ শুশ্রূষা ও পরিচর্যার জন্য। অন্তরে আফসোস ও অনুশোচনার অন্ত নেই–হায়...হায়, এ আমরা কী করলাম। এ কি সেই রামায়ণ বর্ণিত রাজা দশরথকৃত হরিণশিশু ভ্রমে অন্ধকমুনির পুত্রহত্যার আদিম পাপেরই পুনরাবৃত্তি ? জীবের প্রাণ যে কত মূল্যবান, জীবই যে শিব, অকারণে বা নিছক খেয়াল বা লোভের বশে অথবা অসতর্কতার জীবহিংসায় যে কতদূর মর্মান্তিক শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, মানুষের জীবনে নিয়ে আসতে পারে নিদারুণ অভিশাপ, রামায়ণের কাহিনী তো তারই দৃষ্টান্ত।

আমার যেন কেন মনে হলো এই ঘটনার সঙ্গে রামায়ণের কাহিনীর রয়েছে অনেক দিক থেকেই অদ্ভুত সাদৃশ্য। তবে কি এই জটাজুটধারী শ্মশ্রুগুম্ফমন্ডিত মুখ শীর্ণ দেহ অতিবৃদ্ধ নগ্ন তাপস রামায়ণের অন্ধকমুনির সমসাময়িক পৌরাণিক মুনি-ঋষিদেরই কেউ–কী জানি, বলতে পারি না।

আমি এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে বৃদ্ধের দু'পা জড়িয়ে তাতে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। বললাম, বাবা ক্ষমা কর। হে পিতঃ, অবোধ সন্তানতুল্য আমরা। হরিণ ভেবে গুলি করেছিলাম। আমরা জানতাম না, বুঝতে পারিনি যে আপনি তাতে আহত হবেন, আপনার গায়ে লাগবে ও গুলি। আমাদের পাপের কি কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই ?

বৃদ্ধ মাথা নাড়ল, বলল, না–তোরা–তোর সঙ্গের এই লোকটা আমাকেই মেরেছিস। আমি আপনমনে ক্রীড়া করছিলাম। তোর সঙ্গেব লোকটা আমায় তাক করেই অস্ত্রক্ষেপণ করল অথচ আমি তো তোদের কারো কোনো ক্ষতি করিনি। হে ভাগওয়ান–আমি এখন মৃত্যুপথযাত্রী। আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। আমার অন্তিম সময় ক্রমেই এগিয়ে আসছে–আমার তোরা অন্তত একটা উপকার করবি ? তোদের আর কিছু করতে হবে না, শুধু আমার দেহটাকে নিয়ে তোরা গঙ্গামায়ীর কোলে সঁপে দে, তাহলেই আমার আত্মার শান্তি হবে।

আমরা তিনজনে ধরাধরি করে বৃদ্ধকে কাঁধে করে উতরাইয়ের পথে গঙ্গাস্রোতের কিনারায় নিয়ে এলাম। উঁচু থেকে গঙ্গার ধারাটা সমতলে নেমে এসেছে যেন একটা ফিকে নীল ও সবুজ বর্ণের পান্নাখচিত সুন্দরীর শীর্ণ ওড়নার মত, অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভায় যা উদ্ভাসিত। আমরা যখন বৃদ্ধকে এনে নামালুম জলের ধারে, বৃদ্ধের তখন শেষ অবস্থা।

হাঁফাতে হাঁফাতে কোনোমতে বলল–গঙ্গামায়ীর কোলে নামিয়ে দাও আমাকে, আমি পরমাত্মার কাছে পৌঁছতে যাচ্ছি–ম্যাঁয় পরমাত্মাকে পাস যা রহা হুঁ।

খুনে দেহাতীটা খানিক ইতস্তত করে শেষে সেই ক্ষীণ শীর্ণ জটাজুট ও শ্মশ্রুগুম্ফমন্ডিত মুখ অতি প্রাচীন বৃদ্ধের পলকা দেহটাকে গঙ্গার স্রোতের আবর্তের মুখে ছেড়ে দিল।

পরক্ষণেই ঘটল আর এক অদ্ভুত কান্ড। বৃদ্ধের দেহটা একটা পাক খেয়ে নদীর জলের তলায় তলিয়ে যেতে না যেতে হঠাৎ সেই দেহাতীটা, যার গুলিতে প্রাণ দিয়েছে সেই অতি প্রাচীন বৃদ্ধ, সে অকস্মাৎ রাইফেল ফেলে দিয়ে দুহাতে বুক চেপে মাটিতে শুয়ে পড়ে যন্ত্রণায় কোঁকাতে লাগল। এই ভাবে অসহ্য বেদনায় ছটফট করতে করতে খানিক বাদে তার দেহ স্থির হয়ে গেল, আর নড়ল না। নাড়ী দেখে বুঝলাম সব শেষ। দেহে তার প্রাণ নেই আর।

তার পরে কেটে গেল আজ কত বছর। কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত এ রহস্যের কোনো কূলকিনারা পাইনি। হরিণছানাটা কোথায় পালাল ? ঐ রকম শীর্ণ চেহারার এক সন্ন্যাসী পাহাড়ের অত উঁচুতে ঐ রকম দুর্গম স্থানে কেমন করে পৌঁছল ! কোন উদ্দেশ্যে ? আর তাকে যে গুলি করেছিল সেই তাগড়া জোয়ান বন্দুকবাজ দেহাতী ছোকরাটাই বা অমন হঠাৎ করে রহস্যজনকভাবে ধড়ফড়িয়ে মারা গেল কেন ?

ছবিঃ তুষার চ্যাটার্জী

একটু হাসোঃ

শিক্ষকঃ ইংরেজি লেটারসের শেষেরটি কি ?
ছাত্র : ইয়োর্স ট্রুলি...!

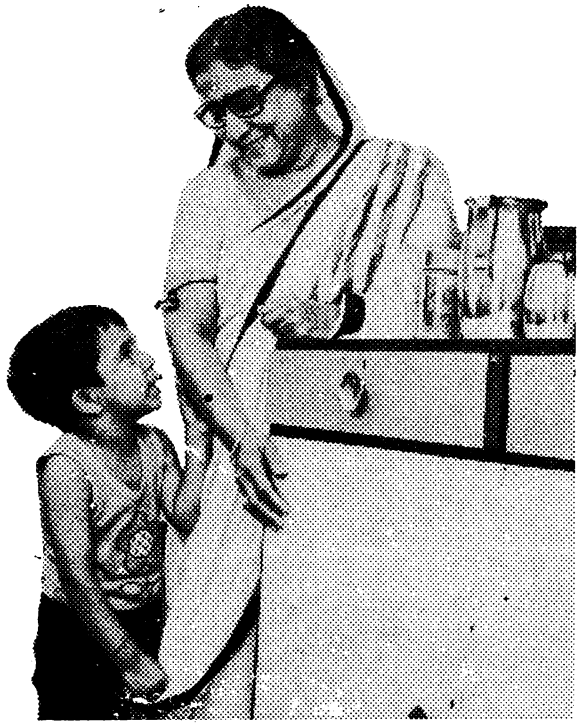

"দিদা, দিদা, বাবা আজকে এতো দুষ্টুমি করছে কেন?"

"কেন রে ছোটন কি করেছে?"

"দেখ না! লক্ষী ছেলের মত খাচ্ছে না।"

"পেট খারাপ হয়েছে যে। পেট খারাপ হলে হজম হয় না, তাই কিছু খেতে ইচ্ছা করে না।"

"কিন্তু না খেলে যে গায়ে জোর পাবে না—আর কালকে বেরোবে কি করে?"

"তুমি কিছু ভেবো না। আমি এমন জিনিস্ দেবো যা চট করে হজম হয়ে যাবে। জান সেটা কি? ওই যে তুমি রোজ যেটা খাও!"

"জানি! রবিনসন্স্ বার্লি।"

"ঠিক বলেছ। এই বার্লি খুব হাল্কা খাবার বলে চট করে হজম হয়। তাছাড়া খাঁটি বার্লির সব গুণই রবিনসন্স্ বার্লিতে আছে। তাই পেট খারাপ হলে ডাক্তারবাবুরাও রবিনসন্স্ বার্লি খেতে বলেন।"

"আচ্ছা দিদা..."

"আর কথা নয়। নাও এই এক গেলাস বার্লি বাবাকে দিয়ে এস দেখি?"

"বাবা, বাবা, এই নাও তোমার রবিনসন্স্ বার্লি।"

রবিনসন্স্ বার্লি

হালকা আহার আর সহজ হজমের পথ্য

LINTAS(C)/ROB/4/2116 BG

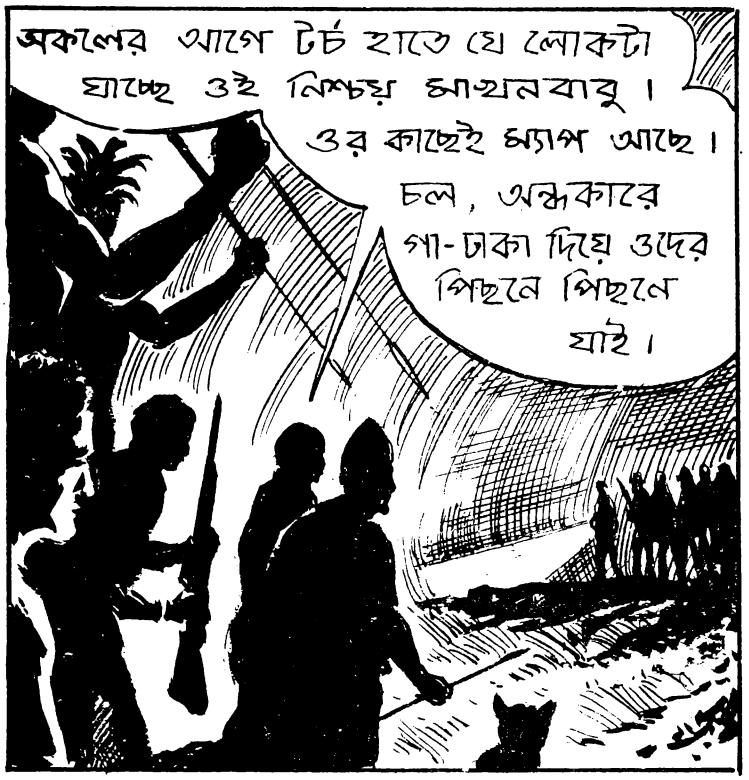
অকলের আগে টর্চ হাতে যে লোকটা যাচ্ছে ওই নিশ্চয় মাখনবাবু। ওর কাছেই ম্যাপ আছে। চল, অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ওদের পিছনে পিছনে যাই।

ভালো কথা বলেছ বিমল। ম্যাপ না থাকল তো কি হল? — ওরাই আমাদের পথ-প্রদর্শকের কাজ করবে।

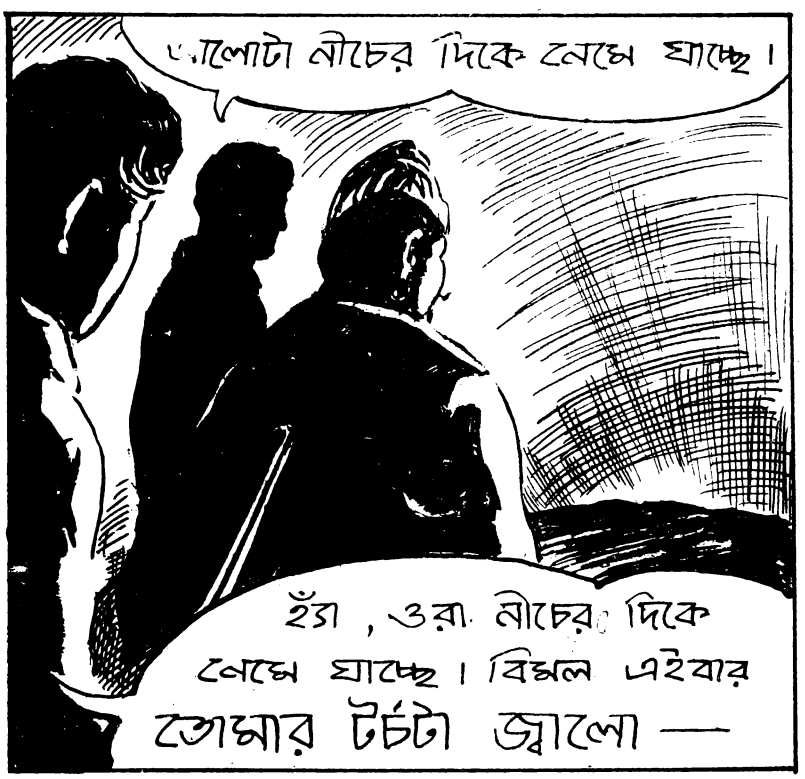
আলোটা নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।
হুঁ, ওরা নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। বিমল এইবার তোমার টর্চটা জ্বালো —

দেখছ কুমার— পাথরের গায়ে ক্ষোদা সুদীর্ঘ সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে।
a-107

প্রায় চারতলা সিঁড়ি ভেঙে আমরা একটা মস্ত উঠানের উপর এসে পড়েছি।
এবার আমরা কোন পথে যাব? শত্রুরা কোন পথে গেছে বুঝতে পারছি না।
দনন্! দনন্!…
উঁনননন!…
বন্দুকের শব্দ! শত শত সিংহের গর্জন!
আহ্-উঁননন!…
ঢং! ঢং! ঢং! ঢং!
আ! আ! আ! আ!
অসংখ্য ঘন্টার শব্দ!
অগণ্য মানুষের চিৎকার!

[চলবে]

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

ভোরের আবছা অন্ধকারে ওরা এগিয়ে চলেছে বাণগংগা গিরিপথের দিকে। রামজী আর কেশবজীকে খুঁজে বার করতেই হবে। একমাত্র ওরাই হয়তো রাজীব মামার সঠিক খবর দিতে পারবে। কিন্তু বাণগংগার পথ কোনদিকে? জিজ্ঞেস করার মতো কেউ কোথাও নেই। গাইড বুক পড়ে যেটুকু জেনেছিল সেই অনুমানে ভর করে ওরা পথ চলতে লাগলো।

প্রায় আধ মাইল যাবার পর এক জায়গায় দেখলো একটি পথ ডানদিকে মানে রাস্তার পশ্চিম দিকে পাহাড় জংগলের ভেতরে ঢুকে গেছে। সেইখানেই বাঁকের মুখে বৌদ্ধ যুগের পুরানো মন্দির মণিয়ার মঠ দেখতে পেল। ডাঃ টি. ব্রক মাটি খুঁড়ে এই মঠটি বের করেছেন। মাটি খোঁড়ার আগে এখানে ভগ্নস্তূপের ওপর একটি ছোট্ট মন্দির ছিল। খননের সময় সেটি ভেঙে যায়। বাবলুরা মন দিয়ে মন্দিরটি দেখলো। প্রাগৈতিহাসিক এই মন্দিরের আকৃতি গোলাকার। দুটি গোলাকার দেওয়াল দিয়ে মন্দিরটি ঘেরা। ভেতরের দেওয়ালে কোনো দরজা নেই। সম্ভবতঃ বাইরের দেওয়ালটি বৌদ্ধ-পরবর্তী যুগে নির্মিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই অঞ্চলে নাগ দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। গিরিব্রজে মণিনাগ এবং স্বস্তিক নাগ নামে দুটি নাগ দেবতার কথা মহাভারতেও উল্লেখ আছে। মণিনাগ এই গিরিব্রজ নগরীর সংরক্ষক ছিলেন। সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে এই মণিনাগের নামানুসারেই এর নাম হয় মণিয়ার মঠ। তাছাড়া পৌরাণিক কাহিনীতে মগধ অঞ্চলে মণিভদ্র নামে যক্ষের পূজার জন্য মণিমালা চৈত্যর উল্লেখ পাওয়া যায়। মণিয়ার মঠ সেই চৈত্য হওয়াও অসম্ভব নয়। তবে স্থানীয় কিংবদন্তি বলে পৌরাণিক যুগে এক রাজা তাঁর সমস্ত ধনরত্ন এইখানে পুঁতে রেখে মণিকার নাগ নামে একটি সাপকে এই ধনরাশির সংরক্ষক নিযুক্ত করেন। সেই নাগের নামানুসারেই এর নাম মণিয়ার মঠ।

বাবলুরা যখন বেশ ভালো করে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখছে তখন হঠাৎ কোথা থেকে এক দাড়ি-গোঁফওয়ালা ঝাঁকড়া-চুলো অল্পবয়সী লোক সেই আধো আলো আধো অন্ধকারে ওদের সামনে লাফিয়ে পড়লো একটা চ্যালা কাঠ হাতে নিয়ে—হট যাও। নেহি তো মার দুংগা। ভাগো হিঁয়াসে। আমার শান্তি নষ্ট যে করবে আমি তাকে সহজে ছাড়বো না। আমি এই মণিকার নাগের মতোই গুপ্তধন

পাহারা দিচ্ছি। আমি এই পাহাড় জংগলের যক্ষরূপী ভগবান। আমি এই বনের রাজা। আয়্যাম দ্যা প্রিন্স অব দিজ ফরেস্ট এ্যান্ড দ্য হিল। আয়্যাম....।

পঞ্চু হাউ হাউ করে তার দিকে তেড়ে যেতেই বাবলু খপ করে ধরে ফেললো পঞ্চুকে। ও বুঝতে পারলো লোকটির মাথার গোলমাল আছে। তাই সমবেদনার সুরে বললো–আপনি রাজা? আপনি এখানে গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছেন?

–হ্যাঁ। আমি নররূপী যক্ষ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমি এই সব পাহারা দিচ্ছি। কালের ঘণ্টা বেজে যাচ্ছে। মহাকালের রথের চাকা বসে যাচ্ছে। কিন্তু আমার নট নড়ন-চড়ন। আমি থেমে থাকছি না। বুঝলে? আমি শুধু খুঁজেই বেড়াচ্ছি।

–কী খোঁজেন আপনি?

–গুপ্তধন।

–গুপ্তধন? কোথায় গুপ্তধন?

–কেন, এখানে! এই তো এরই ভেতরে আছে। এই পথ ধরে সোজা চলে যাও, দেখতে পাবে জরাসন্ধর কোষাগার। অতুল ধনরাশি লুকনো আছে তার ভেতরে। এত ধন যে সমস্ত পৃথিবীটাকেই কেনা যাবে তাই দিয়ে।

–তাই নাকি? তাহলে সেই ধন আপনি নিচ্ছেন না কেন?

লোকটি অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল এবার–ওঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ। চাবিকাঠি। বুঝলে ভায়া আসলে সব কিছুতেই চাবি দেওয়া আছে। কিন্তু সেই চাবি কোথায় কার কাছে তা কেউ জানে না।

বাবলুরা কোনো রকমে পালিয়ে এলো সেখান থেকে। তারপর সোজা এগিয়ে চললো রাজপথ ধরে। এই পথ চলে গেছে বুদ্ধগয়ার দিকে। বাণগংগা হয়ে। অন্তত গাইড বুক তাই বলে। ওরা সেই পথ ধরে যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় দেখলো রাজপথের এক অংশ পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী সেখানে দাঁড়িয়ে পুবের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন।

বাবলু তাঁর কাছে গিয়ে বললো–আচ্ছা সাধুজী, বাণগংগা গিরিপথ কোন দিকে?

সাধুজী বললেন–তুম কৌন হো বাচ্চে?

–আমরা অতি সাধারণ ছেলেমেয়ে। বাণগংগা দেখতে যাব।

–সমঝ গিয়া। পহলে রথচক্র দেখো। রথ কি উতোর।

–রথ কি উতোর?

–হাঁ, রণভূমি আউর রথ কি উতোর।

–কোথায়?

–হিঁয়া পর। উ দেখো।

বাবলুরা সাধুজীর নির্দেশিত স্থানে, মানে সেই পাঁচিল ঘেরা জায়গাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলো প্রাচীনকালের রথের চাকার দাগ। এরই নাম রণভূমি। এই সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থান যেখানে ১৪ দিন ধরে ভীম ও জরাসন্ধের প্রচন্ড মল্লযুদ্ধ হয়েছিল। এবং জরাসন্ধ এখানেই নিহত হয়েছিলেন। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই জায়গাটার মাটির ওপর পাথরের চট্টানের গায়ে প্রগৈতিহাসিক যুগের শংখলিপিও উৎকীর্ণ রয়েছে। বাবলু ওর পকেট থেকে শংখলিপির পাঠোদ্ধার করা কাগজটা বার করে ঐ লিপির সংগে অক্ষর মেলাবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু মিললো না। কিছু বোঝাও গেলো না। কেননা হাজার হাজার বছর ধরে এগুলি সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় লিপিগুলি প্রায় নষ্ট হতে বসেছিলো। এইখানেই পাথরের ওপর ছিল প্রাচীন মগধ নগরীর প্রধান রাজপথ, সেকালের রথের চাকার দাগ বেশ গভীর ভাবে এখনো আঁকা আছে মাটির বুকে। দুই চাকার মাঝের ব্যবধান পাঁচ ফুট। দেখলেই মন হারিয়ে যায় বিম্বিসার অশোকের যুগে। শুধু রথচক্র নয়। এখানকার পাথর ও মাটিতে আরো কিছু অস্বাভাবিক দাগ পরিলক্ষিত হয়। অনেকে বলেন এগুলো ভীম ও জরাসন্ধের ধস্তাধস্তির চিহ্ন।

এইসব দেখার পর ওদের একটাই ধারণা হলো এখানে একমাত্র ঐতিহাসিক নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নেই। না কোনো মানুষের বসতি না অন্য কিছু। অতএব বাণগংগায় যাওয়া মানে বেকার হয়রান হতে যাওয়া। এর চেয়ে সোন ভান্ডারে গেলে হয়তো একটা কাজের কাজ হবে। এই ভেবে যেই না ওরা ফিরতে যাবে অমনি সেই সাধুজী বলে উঠলেন–কি খোকাবাবু! বাণগংগা কি বাত পুছ রহতে থে না?

–হ্যাঁ সাধুজী। কিন্তু আমাদের আর যাবার ইচ্ছে নেই।

সাধুজী এবার আধা বাংলা আধা হিন্দীতে ওদের যা বললেন তার অর্থ হলো রাজগীর উপত্যকার সর্বাপেক্ষা রমণীয় স্থান বাণগংগা গিরিপথ। শংখলিপি এবং রথচক্র চিহ্ন ছাড়িয়ে আর একটু দক্ষিণে এগিয়ে গেলে উপত্যকার দক্ষিণ-প্রান্তে একটি ছোট নদী দেখতে পাওয়া যায়। নদীটি সোনাগিরি পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। কথিত আছে, মুমূর্ষু জরাসন্ধ তৃষ্ণার্ত হয়ে জল চাইলে

[illegible] কৃ[illegible] আদেশে অর্জু[illegible] মেরে পাথর ভেদ [illegible] এখানে গ[illegible]কে আনয়ন [illegible]। অতএব এটা না দেখে ফিরে যাওয়া উচিত নয়।

বাবলুরা কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এগিয়ে চলল বাণগংগা গিরিপথ দেখতে।

এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যই মনোরম। দুদিক থেকে সোনাগিরি এবং উদয়গিরি পাহাড় নেমে এসেছে নদীটির কোলে। সামনে পিছনে ঢেউ খেলানো পাহাড়ের গায়ে ঘন সবুজের শোভা। দুই পাহাড়ের মাঝখানে ছোট্ট গিরিপথের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। পথের দুপাশে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে প্রাগৈতিহাসিক পাথরের প্রাচীর। যা নাকি এককালে সিসিল দ্বীপের সাইক্লো-পিয়ানরা নির্মাণ করেছিলো।

বাবলুরা যখন বাণগংগা দেখে ফিরে এলো সাধুজী তখনও সেখানে একভাবে দাঁড়িয়ে। ওদের দেখে বললেন—কি খোকাবাবু, সব কুছ দেখ লিয়া তো তুমনে ?

—হ্যাঁ। আপনার আশ্রম কোথায় সাধুজী ?

—বৈভার পাহাড়ে। সোন ভান্ডার কি বগলমে।

বাবলু বলল—আচ্ছা সাধুজী, এখানে রামজী কেশবজী নামে কেউ আছেন ?

সাধুজী হেসে বললেন—রামজী ভি আছেন, রহিমজী ভি আছেন।

—না না, রহিমজী নয়। রামজী কেশবজী।

—আরে যো রাম ও হি কৃষ্ণ। আও মেরে সাথ।

বাবলু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো—নাঃ, থাক। আপনি যান। আমরা একটু অন্যত্র যাব।

সাধুজী এবার গম্ভীর গলায় বললেন—নেহি খোকা-বাবু, তুমকো আনেই পড়েগা মেরে সাথ।

—কিন্তু আমাদের তো যাবার প্রয়োজন হচ্ছে না। বিশেষ করে আপনাকে দেখে রীতিমতো সন্দেহ হচ্ছে। আমরা আর যাচ্ছি না।

সাধুজী বললেন—তুমনে রঘুনাথ কো খতম কর দিয়া আচ্ছা কিয়া। ও মেরা দুশমন থ্য। লেকিন ও নক্সা যো তুমহারা পাশ মে হ্যায় ও মুঝে দে দো। হামারা আদমি কো মার ডালকে ও চীজ রঘুনাথনে চুরায়া। বলেই রিভলবার বার করলেন সাধুজী।

পঞ্চু তৈরিই ছিলো। 'গাঁক' করে লাফিয়ে উঠে চোখের পলকে কামড়ে ধরল সাধুর হাতটাকে। সংগে সংগে ট্রিগারে চাপ পড়তেই 'গুড়ুম'। ভাগ্যে গুলিটা লাগেনি কারো গায়ে।

তবে গুলির শব্দের সংগে সংগেই পঞ্চু ভয় পেয়ে ছেড়ে দিয়েছিল হাতটা। আর বাবলুও সেই মওকায় কেড়ে নিয়েছিল রিভলবারটা। পঞ্চু যখন ভয়ের ঘোরটা কাটিয়ে আবার আক্রমণ করতে যাবে, সাধু অমনি চোখের পলকে বিশ হাত দূরে সরে গেলো। কী অদ্ভুত কায়দা। আর কী দারুণ প্র্যাকটিশ। সাধুজীর পায়ের নিচে একটা রোলার স্কেট লাগানো ছিলো। তাইতেই হড়কে বেরিয়ে গেলো সে।

বিলু চিৎকার করে উঠলো—ফায়ার, ফায়ার।

বাবলু বললো—কোনো প্রয়োজন নেই। এ অবস্থায় লক্ষ্য ঠিক রাখা যাবে না।

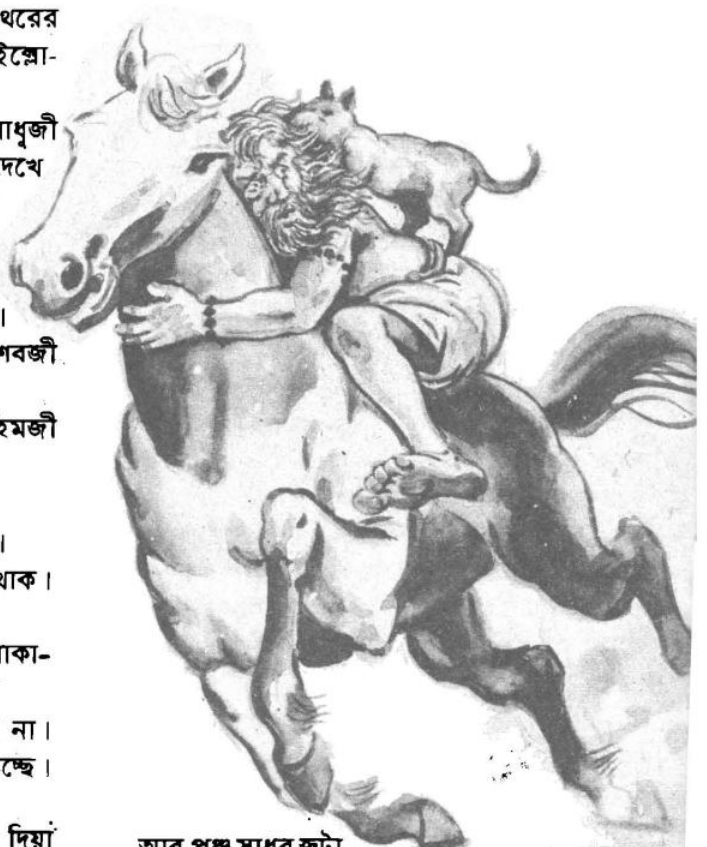

আর পঞ্চু সাধুর জটা কামড়ে চেপে আছে ঘাড়ের ওপর।

কিন্তু পঞ্চু তো ছাড়বার পাত্র নয়। সে তখন উল্কার গতিতে ছুটেছে সাধুজীকে ধরবার জন্য।

বাবলুরা বুঝতে পারলো আসল লোকেরই সন্ধান পেয়েছে ওরা। ইনি সাধু নন। মেকআপ নেওয়া পুরোপুরি নকল মহারাজ। এই দলটি যেভাবেই হোক বুঝে গিয়েছে বাবলুরা এবার এই সব অঞ্চলে হানা দিতে পারে। তাই বিশেষ বিশেষ জায়গায় ওরা এক একজনকে ফিট করে রেখেছে। মণিয়ার মাঠের ঐ পাগলও হয়তো এদেরই স্পাই।

যাই হোক, বাবলুরা ছুটলো পঞ্চুর পিছু পিছু।

সাধুজী ও পঞ্চু কাউকেই আর দেখা যাচ্ছে না। তবুও ওরা অনুমানে ভর করে রত্নগিরি পাহাড়ের কোলে জীবকের আমবাগানের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো। তারপর পঞ্চুর ভৌ ভৌ ডাক শুনে ছুটলো রত্নগিরির দিকে। রত্নগিরি পাহাড় ছিল বুদ্ধের অতি প্রিয় স্থান। এই পাহাড়েরই দক্ষিণ অংশের নাম গৃধ্রকূট। ভগবান বুদ্ধদেব এই পাহাড়ে অনেকবার বাস করেছেন। এই পাহাড়ের চূড়ায় যে সমতল স্থান আছে সেখানে বসে বুদ্ধদেব শিষ্যদের ধর্মশিক্ষা দিতেন। এবং শিখরের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত একটি গুহায় বসবাস করতেন।

পাহাড়টির উচ্চতা ১১০০ ফুট। মহারাজ বিম্বিসার এই পাহাড়ে ওঠার সিঁড়ি তৈরি করে দেন। তবে পঞ্চবিংশতি শত বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসবের সময় বিহার সরকার এই পাহাড়ে ওঠার জন্যে একটি পাকা রাস্তাও করে দিয়েছেন। জাপানিরা করে দিয়েছে রোপওয়ে। জাপানি বৌদ্ধ সংঘের অধ্যক্ষ ফুজি গুরুজী ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এখানে নির্মাণ করিয়েছেন বিশ্বশান্তি স্তূপ।

বাবলুরা ছুটতে ছুটতে এখানে এসেও সাধুজী বা পঞ্চু কারো দেখা পেলো না। ওরা যখন উৎকণ্ঠিত হয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছে তখন হঠাৎ রোপওয়ে চালু হওয়ার ঘর্ ঘর্ শব্দ শুনতে পেল ওরা।

ওরা চমকে ফিরে তাকিয়েই দেখল সাধুজী রোপওয়ের একটা চেয়ারে বসে আছেন আর পঞ্চু তাঁর পা-টাকে কামড়ে বিপজ্জনক ভাবে ঝুলছে। সাধুজী বার বার চেষ্টা করছেন আর এক পায়ে লাথি মেরে তাকে ফেলে দেবার। কিন্তু পারছেন না। সত্যি, কী ডেঞ্জারাস পঞ্চুটা! রাগলে ওর জ্ঞান থাকে না। পড়ে মরবে সে ভয় নেই। এরা নিচে থেকেই হাততালি দিয়ে বলে উঠল—সাব্বাস পঞ্চু।

বাবলু বললো—তোরা একটু অপেক্ষা কর এখানে। আমি ওদের পিছনে একটু ধাওয়া করি। যদি কোনোরকমে বেকায়দায় পড়ে পঞ্চু তখন ওকে রক্ষা করতে পারব।

বিলু বলল—তুই একা যাবি কেন? আমরাও যাব। বলেই ওরা ঝুপঝুপ করে ঝুলন্ত রোপওয়ের এক একটি চেয়ারে বসে পড়লো। তারপর যত ওপরে উঠতে লাগলো ততই বুক ঢিপঢিপ করতে লাগলো ভয়ে। রোপওয়েটিও তো কম নয়। ২২০০ ফুট লম্বা। মোট ১১৪টি চেয়ার আছে।

যাই হোক, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওপরে পৌঁছে গেলো ওরা। কিন্তু পঞ্চু কিংবা সাধুজী কাউকেই দেখতে পেলো না। তবুও সেই ফাঁকে একবার বিশ্বশান্তি স্তূপে মাথাটা ছুঁইয়ে নিলো। বাবলু মনে মনে বললো, হে ভগবান বুদ্ধ, তুমি তো বলেছ 'আমি লোকনাথ, আমি ভৈষজ্য গুরু। এবং সর্বস্বত্বরক্ষক। আমি জানি মানুষ ধর্মবিমুখ, ভোগ-বিলাসে লিপ্ত এবং অজ্ঞানী। তবুও আমি গৃধ্রকূটে অবস্থান করে সর্বদা সম্যক সম্বোধিকা উপদেশ দিই।' তুমি তাহলে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেও অনন্তকাল এই পাহাড়ে জাগ্রত আছ। তুমি আশীর্বাদ করো যেন আমরা তোমার এই পবিত্র শান্তিতীর্থ হতে অশান্তি দূর করতে পারি এবং হিংসার নাশ হয় এখানে।

বলতে বলতেই দেখা গেলো রক্তাক্ত পঞ্চু শান্তিস্তূপের পিছন দিক দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে এবং বাবলুদের ইঙ্গিতে যেতে বলছে রোপওয়ের দিকে।

বাবলুরা ছুটে উঠে পড়লো রোপওয়েতে। পঞ্চু বাবলুর কোলের ওপর বসল। ওরা দেখলো সাধুজী তখন অন্য একটি চেয়ারে বসে একেবারে পাহাড়ের পাদদেশে নেমে পড়েছেন।

এমন সময় এক অঘটন ঘটে গেলো। ওরা যখন অর্ধপথে তখন হঠাৎ মেসিনের ঘরঘরানি বন্ধ হয়ে গেলো। রোপওয়ের চেয়ারে বসে শূন্যে ঝুলে রইলো ওরা। সবাই একসঙ্গে চেঁচাতে লাগলো রোপওয়ে চালু করবার জন্য। পঞ্চুও ওর ভৌ ভৌ চিৎকারে সাড়া জাগালো চারিদিকে।

সাধুজী তখন রোপওয়ে থেকে নেমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে গিয়ে টাঙ্গাওয়ালাদের গাছের গায়ে বেঁধে রাখা একটা ঘোড়া খুলে নিয়ে তাইতে চেপে পালালেন। সেই দৃশ্য দেখেই পঞ্চু লাফিয়ে পড়লো একটি বড় পাথরের ওপর। তারপর পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ছুটতে ছুটতে তাড়া লাগালো সাধুজীকে।

বাবলুরা কিন্তু পঞ্চুর মতো দুঃসাহসী হতে পারলো না। চেষ্টা করলে হয়তো লাফিয়ে পড়া যেতো। তবু ওরা পারলো না লাফাতে।

যাই হোক, ওদের চেঁচানিতে এবং নিচের

টাংগাওয়ালাদের চিৎকারে রোপওয়ে আবার চালু হলো। ওরা নিচে নামলে রোপওয়ের লোকেরা খুব বকাবকি করলো। ওরা বললো, রোপওয়ে এখন বন্ধ। কিছুদিন আগে এখানে একটি চেয়ার ছিঁড়ে পড়ে গিয়ে একজনের মৃত্যু হওয়ার পর এখন মেরামতির কাজ চলছে। আজ অবশ্য পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হচ্ছিলো। তাছাড়া এতে এমনি চাপা যায় না। যাতায়াতের জন্য এক টাকার টিকিট লাগে। বৃহস্পতিবার বন্ধ। শীতকালে সকাল সাড়ে দশটা থেকে দেড়টা, দুপুর দুটো থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এবং গ্রীষ্মকালে সকাল ছ'টা থেকে ন'টা ও বিকেল তিনটে থেকে ছ'টা পর্যন্ত রোপওয়ে চালু থাকে।

বাবলুরা অবশ্য এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে নিলো। তারপর ওরা আবার ছুটলো পঞ্চু ও সাধুর সন্ধানে। নিচে টাংগাওয়ালাদের ভেতরে তখন ঐ ঘোড়া চুরির ব্যাপারে রীতিমতো উত্তেজনা। বাবলুরা সোজা রাস্তায় না গিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তার ধারে পাহাড়ের একটু উঁচু জায়গায় উঠে দেখতে লাগলো সাধুর গতিবিধি। যা দেখলো তাতে চোখ কপালে উঠে যাবার অবস্থা। লাগামহীন ঘোড়ায় চেপে সাধুজী কোনোরকমে ছুটে চলেছেন মণিয়ার মঠের দিকে। আর পঞ্চু সাধুর জটা কামড়ে চেপে আছে ঘাড়ের ওপর।

বাবলুরা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে নেমে এসে ঐদিকে ছুটলো। হঠাৎ পথের ধারে এক জায়গায় দেখতে পেলো সাধুর নকল জটা গড়াগড়ি খাচ্ছে। এ নির্ঘাৎ পঞ্চুর কীর্তি। আরো একটু এগোতেই দেখলো নকল দাড়িগোঁফ। ওরা ছুটতে ছুটতে গিয়ে মণিয়ার মঠের পাশ দিয়ে সোনভান্ডারের পথ ধরলো।

হঠাৎ ওদের পথরোধ করে দাঁড়ালো সেই পাগলটা। চ্যালা কাঠ নিয়ে রুখে দাঁড়িয়ে বললো–ভাগো হিঁয়াসে। কাউকে এদিকে যেতে দেবো না আমি। মেরে মাথা ফাটিয়ে দেবো সব। যাও।

বিলু আর ভোম্বল তখন রুখে দাঁড়ালো–যদি মার না খেতে চাও তো রাস্তা ছাড়।তোম্যা পাগলামি ছুটিয়ে দেবো এখুনি।

বাবলু অদ্ভুত কায়দায় ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটির ওপর।

বাচ্চু আর বিচ্ছু ওর হাত থেকে কেড়ে নিল চ্যালা কাঠখানা।

বিলু বললো–এও নিশ্চয়ই এদেরই লোক। মার ওটাকে । বলেই তার ঝাঁকড়া চুল ও দাড়ি ধরে ঝুলে পড়ল।

লোকটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রাস্তার ওপর। তারপর শুয়ে শুয়ে হাত পা ছুঁড়ে প্রচন্ড চিৎকার করতে লাগলো।

কিন্তু ওর দাড়িগোঁফ খুলে এলো না। অর্থাৎ এগুলো নকল নয়। লোকটির অবস্থা দেখে দুঃখ হলো সকলের।

বাবলু বললো–লোকটার সত্যিই মাথা খারাপ। এ ওদের স্পাই নয়।

আর সময় নষ্ট না করে ওরা ছুটলো সোনভান্ডারের দিকে। এখানে পথ চেনার কোনো অসুবিধে নেই। মোড়ে মোড়ে সরকারি ফলকে পথনির্দেশ। এক সময় ওরা সোন-ভান্ডারে এসে পড়লো–ঐ–ঐ তো গুহা। ঐ তো সেই রত্নখনি।

হ্যাঁ, ওরা ঠিক জায়গাতেই এসেছে। গুহার দক্ষিণে ছয়জন জৈন তীর্থংকরের খোদাই করা মূর্তিই এর প্রমাণ দিচ্ছে। বাবলুরা বিস্মিত চোখে সেই বিখ্যাত গুহা দেখতে লাগলো। দেখলো গুহামুখ কী অপূর্ব কৌশলে বন্ধ করা। ব্রিটিশ আমলে এই গুহার ভেতরে ঢোকার জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টার নিদর্শনস্বরূপ যত্রতত্র তোপের দাগ। কিন্তু দ্বার এমনইভাবে রুদ্ধ যে আজও তা ভেদ করা সম্ভব হয়নি।

না হোক। কিন্তু এখানে পঞ্চুই বা কই আর সেই ভন্ড সাধুই বা কোথায়? ওরা তখন গুহা থেকে বেরিয়ে এসে পিছন দিকে জংগলে ঢুকতে গেলো। কিন্তু ঢোকবার আগেই দলে দলে কিছু দানবাকৃতি লোক আশপাশের গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আচমকা ঘিরে ফেললো ওদের। এবং জনা পাঁচেক লোক ওদের পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে এমনভাবে টিপে ধরলো যে হাত পা ছোঁড়বার ক্ষমতাও আর রইলো না ওদের। বাবলুর হাতের পিস্তল হাতেই রইলো। ওরা ওদের কাঁধে নিয়ে সেই নির্জন বনপথ ও পাহাড়ের গায়ে গায়ে এগিয়ে চললো। এখানে একটি আশ্রম রয়েছে। সেই আশ্রমের চত্বরে এক একটি গাছের সংগে মোটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেললো ওদের।

একজন ভয়ংকর চেহারার লোক এবার বাবলুর কাছে এগিয়ে এসে ওর চুলের মুঠি ধরে বললো–বদমাশ লেড়কা। ও নক্সা কাঁহা হ্যায় দে দো মুঝে।

ও জিনিসে বাবলুর আদৌ কোনো আস্থা ছিলো না। তাই পকেট দেখিয়ে বললো–নিয়ে নাও।

লোকটি বাবলুর পকেট হাতড়ে সেই নক্সা এবং শংখলিপির কাগজটি বার করে নিলো। তারপর বিলুর কাছে গিয়ে বললো–তেরা পাশ ক্যা হ্যায়?

–কিছু নেই।

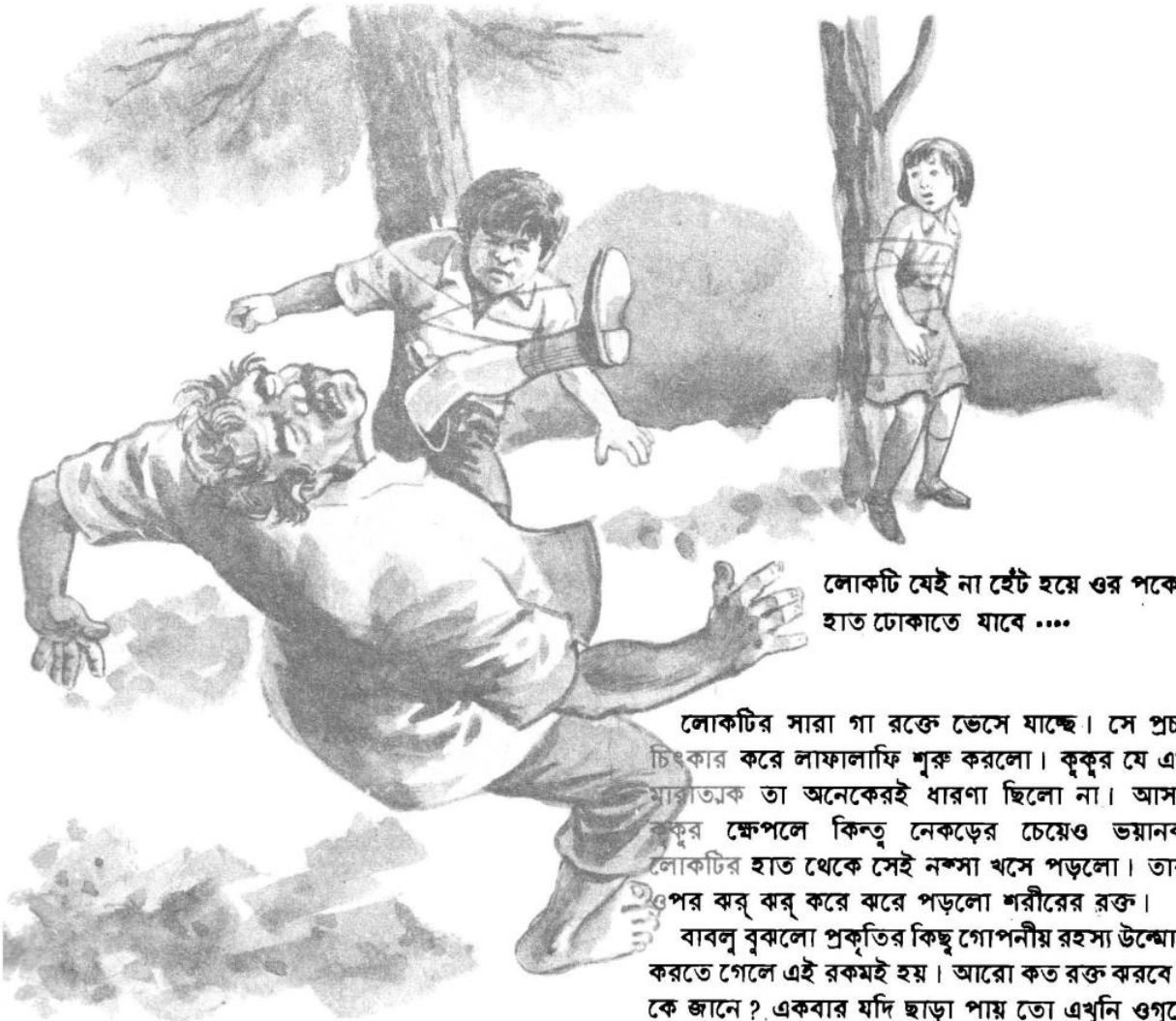

লোকটি যেই না হেঁট হয়ে ওর পকেটে হাত ঢোকাতে যাবে ....

লোকটি তবুও বিলুকে সার্চ করলো। তারপর এলো ভোম্বলের কাছে–তেরা পাশ হ্যায় কুছ ?

ভোম্বল এক চোখ টিপে বললো–দেখোই না, তাহলে টের পাবে।

লোকটি যেই না হেঁট হয়ে ওর পকেটে হাত ঢোকাতে যাবে অমনি ভোম্বল ওর মুখে একটা লাথি কষিয়ে দিলো।

লোকটি তো রেগে ঠাস ঠাস করে চড় মারতে লাগলো ভোম্বলকে।

এমন সময় হঠাৎ ভৌ ভৌ করে পঞ্চুকে ছুটে আসতে দেখা গেলো। কী ভয়ানক দেখাচ্ছে ওকে। মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান করে এসেছে। পঞ্চু 'অ্যাঁউ-উ' শব্দে একটা হাঁক দিয়ে ভোম্বলের আক্রমণকারী সেই ভীষণদর্শন লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। যেই না পড়া অমনি লাঠি সড়কি নিয়ে দলের অন্যান্য লোকগুলো হৈ-হৈ করে ছুটে এলো। বেগতিক বুঝে পঞ্চু লোকটির পিঠ নখ দিয়ে ফালা করে দৌড়ে পালালো।

লোকটির সারা গা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সে প্রচন্ড চিৎকার করে লাফালাফি শুরু করলো। কুকুর যে এমন মারাত্মক তা অনেকেরই ধারণা ছিলো না। আসলে কুকুর ক্ষেপলে কিন্তু নেকড়ের চেয়েও ভয়ানক। লোকটির হাত থেকে সেই নক্সা খসে পড়লো। তারই ওপর ঝর্ ঝর্ করে ঝরে পড়লো শরীরের রক্ত।

বাবলু বুঝলো প্রকৃতির কিছু গোপনীয় রহস্য উন্মোচন করতে গেলে এই রকমই হয়। আরো কত রক্ত ঝরবে তা কে জানে ? একবার যদি ছাড়া পায় তো এখুনি ওগুলো পুড়িয়ে দেয় সে।

এমন সময় একজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো সেখানে–কেশবজী, আপ জলদি আইয়ে, রামজী কা হালত বহুৎ খারাপ হ্যায়।

–ক্যা হুয়া ভাইয়া কো ?

–দেখিয়ে। ও আ রহা হ্যায়....

বলতে বলতেই দাড়িগোঁফহীন সেই সাধুজীকে একটি স্ট্রেচারে শুইয়ে নিয়ে আসা হলো সেখানে। তার পায়ের মাংস, গায়ের মাংস খাবলা করে তুলে নিয়েছে পঞ্চু। একেবারে শেষ অবস্থা।

কেশবজী অর্থাৎ পঞ্চু যার পিঠ ফালা করে দিয়েছিল, বললো–জলদি হসপিটাল লে যাও।

–যানে কা জরুরৎ নেহি। সেন্সলেস হো গিয়া। মালুম হোতা হ্যায় আভি নিধান হো জায়েগা।

–ঠিক হ্যায়। রাম নাম কহো। ঔর হামারে লিয়ে ডাকতার কো বোলাও। তারপর কাকে যেন ডাকলো–শিউপ্রসাদ!

–জী!

–তুম এক কাম করো। ইয়ে পাঁচ পাণ্ডব কো এক এক গোলি সে খতম কর দো।

শিউপ্রসাদ রিভলবার হাতে এগিয়ে এসে বললো–লেকিন ইয়ে সবকো লাশ কাঁহা গিরে গা?

–আরে বুদ্ধু কাঁহেকা। উধার যাকে মিট্টিমে গাঢ় দেনা।

শিউপ্রসাদ বললো–যো হুকুম। বলে এগিয়ে এসে বাবলুদের হত্যা করবার জন্য যখন রিভলবারে গুলি ভরতে লাগলো তখনই হঠাৎ এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেলো।

সেই পাহাড় ও বনতল তখন অসংখ্য কুকুরের প্রচণ্ড চিৎকারে কেঁপে উঠলো। কুকুরগুলো খাঁচা থেকে ছাড়া পাওয়া বাঘের মতো ঘেউ ঘেউ করে যাকে চোখের সামনে পেলো তাকেই আঁচড়ে কামড়ে দিতে লাগলো। সেই সঙ্গে ছুটে এলো শত শত হনুমানের দল। তাদের পুরোভাগে নেতৃত্ব দিচ্ছে শ্রীমান পঞ্চু।

চারদিকে তখন পালাও পালাও রব। কুকুরের কামড় আর হনুমানের থাপ্পড়ে ভুবন অন্ধকার সকলের।

শিউপ্রসাদ তখন বাবলুদের ছেড়ে কুকুর ও হনুমান-গুলোর ওপর গুলি বর্ষণ করতে লাগলো। একটা গুলি একটি হনুমানের বুকে লাগতেই অন্যান্যরা এসে নিমেষের মধ্যে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো লোকটাকে।

বাবলুরা বিস্ময়ে হতবাক।

বিলু বললো–কী ব্যাপার বল তো বাবলু?

বাবলু বললো–ঘোর কলিকাল। এই সব হনুমানরা একদিন রামজীর পক্ষ নিয়ে রাবণজীর বিরুদ্ধে লড়েছিল। এখন আমাদের পক্ষ নিয়ে রামজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

ভোম্বল বললো–রসিকতা রাখ।

বাবলু বললো–আসলে পশুতে পশুর ভাষা বোঝে। পঞ্চু নিশ্চয়ই ওদেরকে ওর ভাষায় আমাদের কথা বুঝিয়ে বলে ডেকে এনেছে। অথবা ওরা পঞ্চুকে দেখেই চিনতে পেরে আমাদের কাছে আসবার জন্য ছুটে এসে সেদিনের লাড্ডু-প্যাঁড়া ও কদলী ভক্ষণের প্রতিদান দিয়েছে আমাদের শত্রুর ওপর চড়াও হয়ে।

যাই হোক, ওরা তো পাঁচজনেই বাঁধা। তাই শুধু দেখতেই লাগলো। কিছু করতে পারলো না। তার ওপরে বাবলু নিরস্ত্র। ওর পিস্তলটা টানা-হেঁচড়ার সময় কোথায় যেন পড়ে গেছে।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেলো সেই উন্মাদবৎ লোকটি লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে এই দিকে–গুপ্তধন–গুপ্তধন–লুঠ হয়ে গেলো, গুপ্তধন।

বাবলু চেঁচিয়ে বললো–না না, লুঠ হয়নি। লুঠ হতে দেবো না। দয়া করে আমাদের বাঁধনটা খুলে দাও।

–দেবো–দেবো নিশ্চয়ই দেবো। তোমরা তো দুগ্ধপোষ্য শিশু। তোমরা এখন মায়ের কোলে শুয়ে দুধ খাবে। তোমাদের কি যুদ্ধ করা সাজে? খবরদার গুপ্তধনে লোভ কোর না তোমরা!

–না না। আমরা গুপ্তধন নিতে আসিনি। বিশ্বাস করো। এসব তোমার। আমরা কখনো নিতে পারি?

–কী বললে? কী বললে তোমরা? এ সব আমার?

–হ্যাঁ, তোমার।

–তবে তো তোমাদের খুলে দিতেই হবে। বলেই লোকটি এসে বাবলুর বন্ধন খুলে দিলো।

তারপর একে একে মুক্তি পেলো সবাই।

পাহাড় ও বনতলে তখন তুলকালাম যুদ্ধ। কুকুর ও হনুমানে একেবারে ছিঁড়ে খাচ্ছে লোকগুলোকে। লোকগুলো কুকুরের তাড়া খেয়ে যেই না গাছে উঠতে যাচ্ছে অমনি হনুমানের থাপ্পড় খেয়ে 'মর গিয়া' বলে লাফিয়ে পড়ছে। তারই ফাঁকে যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। লাঠি সড়কি বন্দুক কারো হাতে নেবার উপায় নেই। ঐসব হাতে দেখলেই তাকে তেড়ে মারতে উঠছে হনুমানগুলো।

বাবলু ছাড়া পেয়ে প্রথমেই খুঁজে পেতে কুড়িয়ে আনলো নিজের পিস্তলটাকে। আর বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু চোখের সামনে যাকে দেখতে পেলো তাকেই পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগলো। কেশবজী পালাবার চেষ্টা করছিলো। বাবলু পিস্তল দেখিয়ে তাকে দাঁড় করালো। বিলুরা ওদেরই সেই দড়ি দিয়ে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেললো কেশবজীকে।

উন্মাদ লোকটি বললো–অল রিয়ার। চলো আমরা গুপ্তধন নিয়ে আসি। আর আমাদের বাধা দেবার কেউ নেই। এই রত্নভাণ্ডার উজাড় করে দেশের গরীব দুঃখীদের সব বিলিয়ে দিই এসো। চলে এসো, চলে এসো সবাই আমার সঙ্গে।

বাবলুরা কৌতূহলী হয়ে ওর সঙ্গে চলতে লাগল।

লোকটি আশ্রমের পিছম দিকে গিয়ে একটি সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লো। তারপর এঁকে বেঁকে একটু এগিয়েই এক জায়গায় কঠিন পাথরের দেওয়ালের ওপর দু'বাহু রেখে ডুকরে কেঁদে উঠলো। বললো–এই দেওয়ালকেও ভেদ করতে হবে। শত শত শক্তিশালী ডিনামাইট দিয়ে

এটাকে ধসাতে পারলেই ঢুকে পড়া যাবে এর ভেতর।

বাবলু বললো–কী আবোল-তাবোল বকছ? এর ভেতরে কি আছে না আছে তা না জেনে শুধু কল্পনা করেই মাথা খারাপ করছ কেন? যদি সত্যিই গুপ্তধনের সন্ধান চাও তাহলে শোন, আমাদের কাছে এর নক্সা আছে। তাই ধরে পরে বরং চেষ্টা করো। এখন চলে এসো তো।

লোকটি চিৎকার করে উঠল–কি বললে, নক্সা? কই কোথায়? কোথায় তোমাদের নক্সা? আমাকে দাও। শীগগির আমাকে দাও।

বাবলুরা গুহার বাইরে এসে সেই রক্তমাখা নক্সাটা কুড়িয়ে এনে ওর হাতে দিতেই ও সেটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বললো–খতম কর দিয়া। কেল্লা ফতে। এই কাগজগুলোই হচ্ছে যত নষ্টের মূল। আমার অমূল্য জীবন নষ্ট হয়েছে এই কাগজগুলোর জন্যে। যাতে আর কারো জীবন নষ্ট না হয় সেই ব্যবস্থাই করে দিলাম। এগুলো অভিশপ্ত। তোমরা কেউ স্পর্শ কোর না ঐ কাগজ। ওরা অনেক রক্ত ঝরিয়েছে, অনেক ঝরাবে। আর ঐ গুপ্তধন? ও কেউ পাবে না। কার সাধ্য ওর ভেতরে ঢোকে? তোমরা তো জান না, কিন্তু আমি জানি। আমি জানি একচক্ষু সাইক্লোপিয়ানদের আত্মা পাহারা দিচ্ছে ঐ অমূল্য ধনরাশি। ওর ভেতরে কেউ ঢুকলে ওরা তাদের গলা টিপে মারবে।

এমন সময় হঠাৎ সেখানে চার পাঁচটি পুলিশের গাড়ি এসে থামলো। পায়েলদির বাবার সঙ্গে যে অফিসাররা ছিলেন তাঁরা, ইনসপেক্টর বড়ুয়া, জনার্দনবাবু এবং ললিতমোহনবাবুও ওদের সঙ্গে এসে হাজির।

ললিতমোহনবাবু ছুটে এসে বাবলুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন–সাবাস বাবলু। অসাধ্যসাধন করেছো।

বাবলু বললো–আমি একা নই। আমরা সকলে। শ্রীমান পঞ্চু এবং এই কুকুর ও হনুরাও।

ললিতমোহনবাবু বললেন–জনার্দনবাবুর মুখে সব শুনে আমরা বৈভার পাহাড়ে যাই। সেখানে তোমাদের না পেয়ে চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিই। গৃধ্রকূট পাহাড়ে গিয়ে অবশ্য হদিস পাই তোমাদের। ওখান থেকে ফিরে আসবার সময় দেখি হনুমান ও কুকুরের তাড়া খেয়ে কিছু লোক ছুটে পালাচ্ছে। তাদের ধরে দু'চার ঘা দিতেই তোমাদের কথা বলে ফেললো ওরা। যাক, আমার আর কোনো আক্ষেপ নেই। দু'দুটো দলকেই ধরিয়ে দিয়েছ তোমরা।

বাবলুরা দেখল পুলিশ এই ডাকাত দলের বহু লোককে অ্যারেস্ট করেছে। কুকুর ও হনুমানের অত্যাচারে প্রত্যেকের অবস্থা সংকটজনক। বাবলুর নির্দেশে কেশবজীকেও অ্যারেস্ট করা হলো। রামজীর মৃতদেহ তখন ধুলোয় লুটোচ্ছে।

সেই অর্ধোন্মাদ লোকটি তখন পাহাড়ের এক উচ্চস্থানে উঠে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, এই গুপ্তধন আর কেউ নিতে পারবে না।

এই গুপ্তধন এখন আমার। এ আমি বুকে করে রাখব। কাউকে দেবো না।

ললিতমোহনবাবু হঠাৎ চমকে উঠে বললেন–কে! কে ও? কার কণ্ঠস্বর! এ যে রাজীবের গলা।

বাবলু বললো–সে কি! রাজীবমামা? আমরা তো ওকে পাগল ভেবেছিলাম।

–না না। ও পাগল নয়। হ্যাঁ, হয়তো ওকে পাগল করে দেওয়া হয়েছে। হতে পারে। তবে ও যে আমার রাজীবের গলা। ও গলা চিনতে আমি তো ভুল করবো না। আমি যে ওকে দিনরাত খুঁজে বেড়িয়েছি।

বাবলু চেঁচিয়ে উঠল–রাজীবমামা! তুমি শীগগির নেমে এসো ওখান থেকে। দাদুভাই তোমাকে ডাকছে।

ললিতমোহনও ডাকলেন–রাজীব। নেমে আয়। আমি এসে গেছি বাবা।

কিন্তু কে নামবে? উন্মাদ তখন প্রবল উন্মাদনায় আরো নাচতে লাগলো। হঠাৎই এক অঘটন। পাহাড়ের সেই উচ্চস্থান থেকে পা হড়কে পড়ে গেলো উন্মাদ। তার কাতর আর্তনাদ বনভূমি কাঁপিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো।

ওরা ছুটে গিয়ে গোল হয়ে ঘিরে ফেললো তাকে। সব শেষ। ললিতমোহনবাবু পুত্রের রক্তাক্ত মৃতদেহটা বুকে নিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

পুলিশরা তখন ধৃত লোকগুলোর কোমরে দড়ি বেঁধে ভ্যান বোঝাই করে নিয়ে চললো থানার দিকে।

বাবলুরা ইনসপেক্টর বড়ুয়া এবং সেই চারজন অফিসারকে ফিসফিস করে বলে দিল সপ্তপর্ণী গুহার সেই গোপন কক্ষে লুকনো সম্পত্তির কথা। তারপর সবাই মিলে সান্ত্বনা দিতে লাগল ললিতমোহনবাবুকে।

রত্নগিরি পাহাড়ে বিশ্বশান্তি স্তূপে তখন বুদ্ধ বন্দনা হচ্ছে। আরতির সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি... ধর্মং শরণং গচ্ছামি...সংঘং শরণং গচ্ছামি...।

শেষ

ছবি : দিলীপ দাস

সব্যসাচী

১

আর বুঝি পারে না সে। শুকিয়ে উঠেছে বুকের ভিতরটা। চোখে দেখছে আগুন-রোদের ঢেউ-খেলানো হল্‌কা। অনেক উপর-আকাশে যদিও, ঠিক তার মাথার উপরেই চক্কোর দিচ্ছে একটা শকুন। ওরা জানে। মরুকান্তারের দিশাহীন তেপান্তরে ঘুরতে ঘুরতে পথহারা কোন অভাগা পরমায়ু শেষ করে আনে যখন, টের পায় শকুনেরা। শেষ নিশ্বাস পড়বার ঢের আগে থেকেই তার সংগ নেয়, ধীরে, অলস, মন্থর পাখায় পাক খায় তার মাথার উপরে, সদা-সতর্ক, সদা তৈরী। ঘনিয়ে আসুক না অন্তিমের সেই মুহূর্তটি, ও ঠিক নেমে এসে বসবে পাশে, বুকের ধুকধুকুনি সত্যি সত্যি থামবার আগেই গলায় বিঁধিয়ে দেবে বল্লমের ফলার মত সূচোলো চঞ্চু।

মরবে অভাগা ঠিকই। এক্ষুণি মরবে। ধৈর্য ধরতে জানে ও।

মরবে নিশ্চয়। তবে মরতে মরতেও হয়ত সময় নেবে দুই দন্ড। ন্যুমার দিক থেকে বিচার করলে সেই সময়টুকুর জন্যে দোপেয়ে জীবটা ন্যুমার দিক থেকে বিচার করলে সেই সময়টুকুর জন্যে দোপেয়ে জীবটা তারই এক্তিয়ারভুক্ত। মরলে আর তাকে ছোঁবে না পশুরাজ সিংহ, কিন্তু জ্যান্ত যতক্ষণ আছে–

এই হতচ্ছাড়া অঞ্চলটায় ন্যুমা শিটাদের বরাতে বারো মাসই দুর্ভিক্ষ। খাদ্য পশু, হরিণ, বরা, শূকর, খরগোশ একান্তই অপ্রচুর। আর মানুষ? নৈব নৈব চ। এমন সিংহ, এমন চিতা ঢের আছে এই সব পাহাড়-ঘেরা উপত্যকা অধিত্যকায়, যারা জন্ম-জীবনে মানুষের চেহারা দেখে নি। কোন প্রয়োজনে মানুষ আসবে এই রোদ-ঝলসানো শ্মশানে। এক ফোঁটা জল যেখানে নেই, এক বিঘৎ ছায়া দেবার মত একটা গাছ যেখানে চোখে পড়ে না, সারা দিনমান একটানা পা চালিয়ে গেলেও?

না, খাবার এখানে মেলে না পশুরাজ সিংহের। যেদিন একটা বরার বাচ্চা উদরে পুরতে পারে, সেটাকে সে বিবেচনা করে বিশেষ একটা শুভদিন বলে। সে-হিসাবে আজকের এই দিনটাকে কী ভাববে সে? সকালে উঠে গুহা থেকে বেরিয়ে সবে গিরিসানুতে দাঁড়িয়েছে, দূরের নাবাল মাঠে চোখে পড়ে গেল জলজ্যান্ত মানুষ!

শুভ প্রভাত! লাল হরফে লিখে রাখবার মত দিন একটা।

মানুষটা হেঁটেই আসছিল। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ পড়ে গেল উপুড় হয়ে। আকাশে শকুন। তার মানে, এক্ষুণি অক্কা পাবে মানুষটা। শকুনেরা গুনতে জানে। কে কখন মরবে, আগে থেকেই টনক নড়ে ওদের। এ-মানুষটাকে যদি ভোগে লাগাতে হয়, তৎপর হতে হবে ন্যুমা মহারাজকে। লম্ফে লম্ফে সে উৎরাই নামতে লাগল।

সে যে নামছে, তা দেখেছে মাত্র দু'টি প্রাণী। একটি ঐ শূন্যচর শকুন, অন্যটি টারজান।

টারজান এখানে কেন?

টারজান এখানে শুধু এই কারণে যে সে শুধু বনচর অর্ধনগ্ন টারজান নয়, পিতৃপরিচয়ে সে লর্ড গ্রেস্টোকও। ফরাসী বন্ধু দ্যার্নো তাকে ওয়াজিরি অরণ্য থেকে টেনে নিয়ে লন্ডনের হাউস অব লর্ডস-এ পৈতৃক আসনে বসিয়ে দিয়েছিল যেদিন, আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সংগে তারও পরোক্ষ যোগাযোগ সেইদিন থেকেই শুরু হয়েছিল। উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার জনৈক বহুসম্মানিত, অথচ সামরিক শক্তির দিক দিয়ে নগণ্য সম্রাট তাই টারজানেরই শরণ নিয়েছেন, আসন্ন বৈদেশিক আগ্রাসনের প্রতিরোধকল্পে আরণ্য যুদ্ধের পরিকল্পনা গড়ে দেবার জন্য। দক্ষিণ ইউরোপের কোন রাষ্ট্র নাকি অচিরেই স্থল, জল ও বিমান বাহিনীর ত্রিমুখী অভিযান চালাতে চাইছেন তাঁর দেশের বিরুদ্ধে; সম্রাটের এদিকে নৌসেনা বা বিমানবাহিনী বলতে কিছু নেই। স্থলবাহিনী নামকে-ওয়াস্তে যা-কিছু আছে, গিরি-বন-বহুল দেশটাতে তাদেরই যদি গেরিলা-যুদ্ধে নামিয়ে দেওয়া যায়–সেই চেষ্টাই করতে চান সম্রাট।

কী ভাবে কী করা উচিত, তারই পরামর্শ চেয়েছেন সম্রাট। টারজান যাবে, দেখবে, পরামর্শ দেবে, ফিরে আসবে। দক্ষিণ ইউরোপের রাষ্ট্রটির সংগে তার কোনো বন্ধুত্ব নেই, নেই উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার এই ঘটি-ডোবে-না-তালপুকুর শ্রেণীর সম্রাট মহোদয়ের সংগেও। তবে যুদ্ধ জিনিসটাকে সে ঘৃণা করে। এবং যুদ্ধ বাধলেই সে নিজের সহানুভূতি আর সহযোগিতা সর্বান্তঃকরণে উজাড় করে দেয় আক্রান্ত দেশের অনুকূলে। তাই টারজান সাড়া দিয়েছে সম্রাটের অনুরোধে, তাই আজ অশুভ প্রভাতে তাকে আমরা কালকালা কান্তারে দেখতে পাচ্ছি ধরাশায়ী মুমূর্ষু মানুষটার অদূরে।

মানুষটাকে সে দেখে নি। দেখতে পায় নি এই কারণে যে মানুষটা পড়েছে অপেক্ষাকৃত নাবাল জায়গায়।

তা সে না দেখুক মানুষটাকে, আকাশের ঐ যে স্কা (শকুনি), ওকে তো স্পষ্টই দেখেছে! মাটিতে মৃত বা মুমূর্ষু কেউ না থাকলে স্কা অমনভাবে পাক খেতো না আকাশে। আর ঐ পাহাড়ের গায়ের ন্যুমাটা? নীচের মাঠে শিকার দেখতে না পেলে ও অমনধারা নিঃশব্দে অথচ দ্রুত লম্ফে দৌড়ে আসত না কখনও। আছে কেউ সমুখের ঐ মাঠখানায়।

মানুষ? না-হওয়াই সম্ভব। মানুষ এ-তল্লাটে নেই। যেদিকে খুশী দুই চার দিনও হেঁটে যাও যদি, মানুষ তোমার চোখে পড়বে না। এই কিলিমাঞ্জারো গিরিশ্রেণী, এতে লোকবসতি কোথাও নেই। অন্ততঃ পাহাড়গুলোর দক্ষিণ দেয়ালে তো নয়ই। টারজানের অবশ্য জানা আছে, পাহাড়ের তুংগে তুংগে কালো মানুষদের বস্তি আছে কোথাও কোথাও, কিন্তু সে কি আর এখানে? সেখানকার কোন নরখাদক কাফ্রী এতদূর চলে আসবে ন্যুমার থাবায় এবং স্কার ঠোকরে জান দেবার জন্য, এমন তো বিশ্বাস হয় না টারজানের।

তবে? এগিয়ে গিয়ে দেখতেই হল।

ন্যুমা এসে পড়েছে। টারজানকেও গতিবেগ বাড়িয়ে দিতে হল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে দু'জনেই এসে পড়ল এমন একটা জায়গায়, যেখান থেকে ধরাশায়ী অচৈতন্য দেহটাকে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। টারজান দেখল–মানুষটার গায়ের রং সাদা, আর পোশাকও ইউরোপীয় ধাঁচের। একটু পুরোনো, জীর্ণ বটে পোশাকটা, তবু এখনও তাতে জৌলুস কিছু আছে। অর্থাৎ, লোকটা একেবারে আজে-বাজে লোক নয়। ভদ্রবংশীয় তো বটেই, হয়ত আভিজাত্যের দাবিও থাকতে পারে তার।

ন্যুমা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে তার শিকারের অদূরে। ঐখান থেকেই লাফ দেওয়ার কথা তার। তৈরীও সে হচ্ছিল সেজন্য। অর্থাৎ শুয়ে পড়েছিল লম্বা হয়ে, পেট প্রায় মাটিতে ছুঁইয়ে। ঈষৎ ঈষৎ নড়ছিল তার লেজের ডগাটা। এটা যে ন্যুমাদের লাফ দেবার প্রস্তুতি, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকেই তা জানে টারজান।

আর দেরি নয়। ন্যুমাকে এইবেলা জানিয়ে দিতে হবে যে অদূরের ঐ লোভনীয় নরদেহটি বেওয়ারিশ মাল নয়, ইচ্ছে করলেই ন্যুমা তাকে খাবলে খাবলে উদরে পুরতে পারে না। নিজের স্থানে নিশ্চল দাঁড়িয়ে সে একটা চাপা গর্জন ছুঁড়ে মারল ন্যুমার উদ্দেশে।

সে-গর্জন শুনে ন্যুমাকে থমকে যেতে হল একটুখানি।

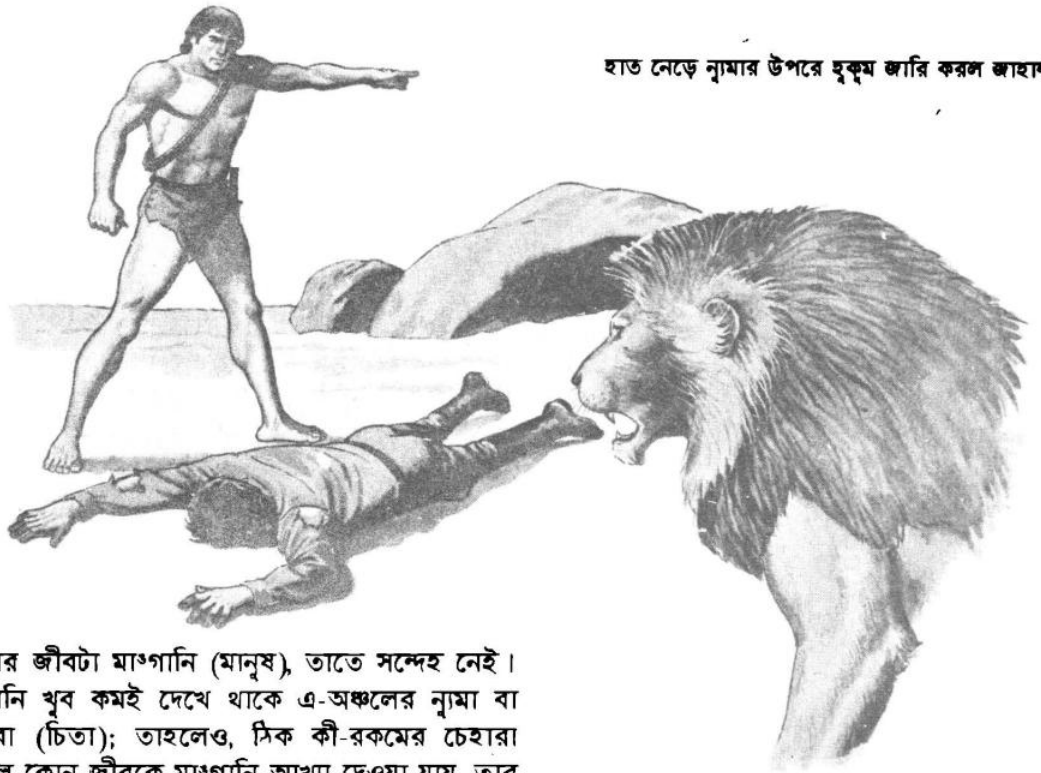

হাত নেড়ে ন্যামার উপরে হুকুম জারি করল জাহান্নমে যেতে

সমুখের জীবটা মাংগানি (মানুষ), তাতে সন্দেহ নেই। মাংগানি খুব কমই দেখে থাকে এ-অঞ্চলের ন্যামা বা শিটারা (চিতা); তাহলেও, ঠিক কী-রকমের চেহারা দেখলে কোন জীবকে মাংগানি আখ্যা দেওয়া যায়, তার একটা মোটামুটি ধারণা আছে বই কি এদের! সে থমকে দাঁড়াল। মাংগানিটার গজরানি ভাল লাগছে না ন্যামার।

থমকে দাঁড়াল, এবং নিজেও ছাড়ল একটা পালটা গজরানি। গজরানির ভিতর দিয়ে একটা ব্যংগ-মেশানো প্রশ্ন। "আমায় দূর হয়ে যেতে যে বলছ, তার কারণটা কী হে দোপেয়ে জীব? শিকারটা নিজের পেটে পুরতে চাইছ নাকি? আমি তো যেন শুনেছিলাম যে টারমাংগানিরা (সাদা মানুষ) নিজের জাতের মাংস খায় না, খায় গোমাংগানিরা (কালো মানুষ)!"

টারজান ব্যংগটাতে কান দিল না। শুধু হাত নেড়ে ন্যামার উপরে হুকুম জারি করল জাহান্নমে যেতে। সংগে সংগে সে দৃঢ় পদে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ঠিক ধরাশায়ী লোকটার পাশে। ন্যামা তখন স্পষ্টতঃই রেগেছে। গর্জন শুরু করেছে গজরানি ছেড়ে। রীতিমত গালিগালাজ। সিংহভাষায় যা সব সে বলে যাচ্ছে, তা শুনে তৃপ্ত হওয়ার কথা নয় টারজানের। দুর্ভাগ্য ওর, অধিকাংশ আরণ্য জীবের ভাষাই সে অল্পবিস্তর বোঝে। এবং সৌভাগ্য এটাই যে নিজের মনের কথা তাদের বুঝিয়েও দিতে পারে তাদেরই ভাষায়।

ন্যামা গালি দিয়ে যাচ্ছে, টারজান তা শুনে যাচ্ছে। ওদিকে নিজের কাজে সে কিন্তু তৎপর। মাটি থেকে টেনে তুলে অচৈতন্য দেহটা সে তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে। লোকটা মরে নি এখনও। একটু জল ওর মুখে দিতে পারলে হয়ত ও বেঁচেও যেতে পারে আপাততঃ। টারজান চলেছে সেই জলের সন্ধানে।

জ-ল? জল আছে নাকি এই কালকালা কান্তারের দৈর্ঘ্য প্রস্থের মধ্যে কোনো অভিশপ্ত রন্ধ্রে?

ন্যামা জানে যে নেই তা। জানে ঐ নভশ্চর স্কা। কিলিমাঞ্জারো গিরিমালার এই নিকট-বলয়ের কৃষ্ণকায় বাসিন্দা, যত উপজাতি, তারাও সবাই জানে যে জল নেই কালকালায়।

কিন্তু টারজান জানে অন্যরকম। কালকালায় সে আগে কোনদিন আসে নি। কিন্তু এই প্রথমবার এসেই, ভূ-প্রকৃতির কতকগুলি জাজ্বল্যমান লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেই, সে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছে যে জল আছে কালকালায়। সে জল অবশ্য ফোয়ারার আকারে স্বতঃ উৎসারিত হচ্ছে না, বা ঝর্ণার আকারে ঝরঝর পড়ছে না

ঝরে। তবু সে আছে। মাটির উপরে নয়। অন্ততঃ তিন ফুট নীচে। তাও সর্বত্র নয়, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্থানে।

ঠিক কোন স্থানে, তা কী করে বুঝবে মানুষে?

না, মানুষের বুঝবার কোনো উপায় নেই। তবে টারজানের কথা আলাদা। জন্মসূত্রে সে মানুষ, সন্দেহ নেই। কিন্তু দীক্ষায়, শিক্ষায় সে হল মহাকপি জাতীয় জীব। আরণ্য প্রকৃতির কোন লক্ষণ দেখে কিসের ইঙ্গিত পাওয়া উচিত, তা সে তার ধাইমা কালার কাছ থেকে শৈশবেই শিখেছিল। তাই অদূরেই একটা নিম্নভূমিতে কিছু কিছু সবুজ আগাছার অস্তিত্ব দেখে সে আশা করতে পেরেছে যে আর কিছু নয়, ঐ আধা-সবুজ আগাছাগুলির নীচে জলের ধারা আছে একটা; কিছু পরিমাণ মাটি তুলে সেই গোপন ধারার মুখটা খুলে দিতে পারলেই সেই জলরূপী জীবনকে চাক্ষুষ দেখতে পাওয়া যাবে।

টারজান অচৈতন্য মানুষটাকে কাঁধে করে নিয়ে সেই নিম্নভূমিটায় চলে গেল। পিছনে দাঁড়িয়ে ন্যুমা খকখক করে হাসল খানিকটা। হাসিটা অর্থব্যঞ্জক, "দৌড়িয়ে না নাগাল পেলাম, বাপের পুণ্যে ছেড়ে দিলাম" জাতীয় অর্থ। হাসতে হাসতেই ন্যুমা গিরিসানুর দিকে পা চালিয়ে দিল আবার। সে এবার গুহায় ঢুকে এই আগুন-রোদের থেকে আত্মরক্ষা করবে। শিকারের কাল এটা নয় তার, সে হল রাতের বেলার কাজ। এখন সকাল বেলায় দৈবাৎ একটা মাংগানির দর্শন পাওয়া গিয়েছিল যখন, দেখা গেল চেষ্টা করে তাকে উদরে পুরবার। চেষ্টা হল না সফল। কী আর করা যাবে। সন্ধ্যে-নাগাদ মন্দ বরাতটা ভালোর দিকে ঘুরবে, আশা করা যাক।

প্রবীণ বিচক্ষণ নভশ্চর স্কা ততক্ষণ নিঃশব্দে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে কালকালার আকাশ থেকে। মাংগানিটা এই মুহূর্তে আর নিশ্চয় মরছে না। পরে যদি তার এন্তেকাল এসেই পড়ে, স্কা ঠিকই খবর পেয়ে যাবে।

ওদিকে টারজান ভীষণ ব্যস্ত। আগাছার ঝোপে অচৈতন্য লোকটাকে শুইয়ে রেখে সে মাটি খুঁড়তে লেগে গিয়েছে। কোমরে তার একখানা বৃহৎ ছোরা বরাবরই থাকে, এটা তার পৈতৃক সম্পত্তি। এদিকে কালকালার মাটিতে মাটি খুব কম। বেশীর ভাগ জায়গাতেই নীরেট পাথরের আবরণ। যেখানে তা নয়, সেখানে ঝুরো বালির। বলা বাহুল্য, এই নিম্নভূমিটাতে পাথর নেই, থাকলে এখানে আগাছার জন্ম সম্ভব হত না।

ছোরা দিয়ে ঝুরো বালি খুঁড়তে সময় যতই লাগুক, মেহনত বিশেষ কিছু হওয়ার কথা নয়, বিশেষ করে টারজানের পক্ষে। দেখতে দেখতে দেড় ফুট ব্যাসের

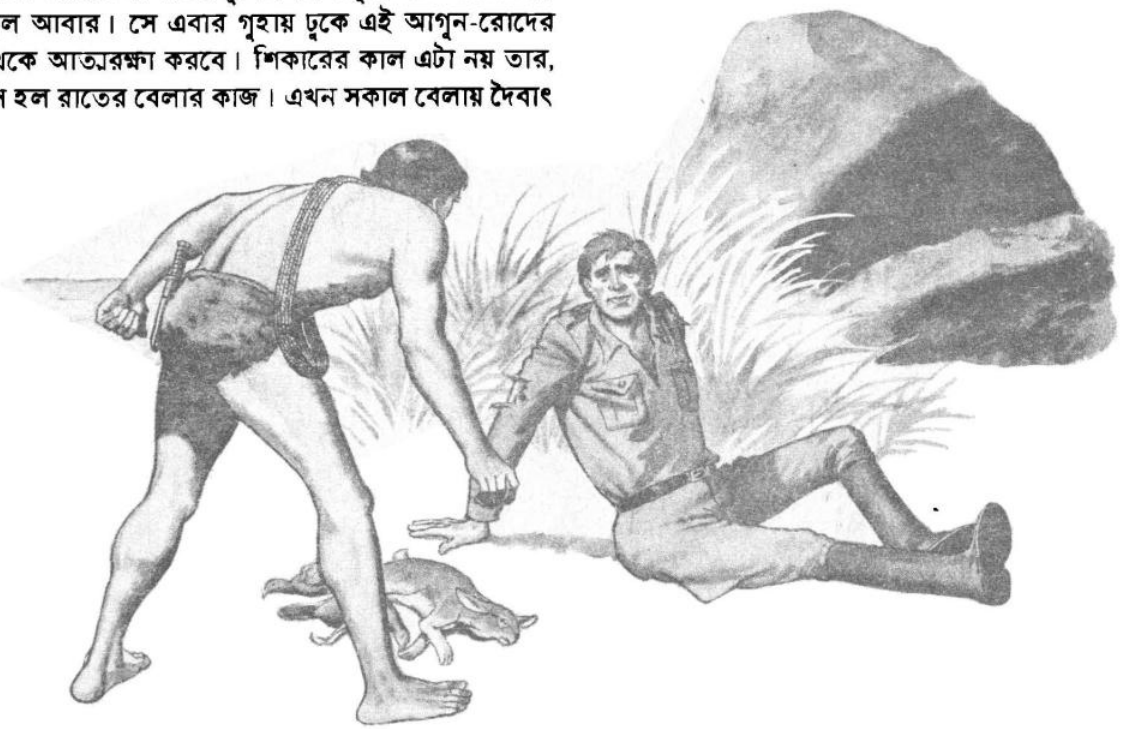

"তুমি কে, যেই হও, তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

একটা কূপ সে খুঁড়ে ফেললো। আন্দাজ তিন ফুট গভীর, দেখতে দেখতেই সে-কূপ ভরে উঠল নির্মল জলে।

মাথায়, কপালে জলের লেপ, ওষ্ঠে, জিভে জলগণ্ডূষ, তারপর চোখে মুখে মৃদু মৃদু জলের ঝাপ্টা–

এইসব করতেই অচেতন লোকটা চোখ মেলে চাইল। অমনি এক আঁচলা জল আবার তাকে দিল টারজান। এবার ঢেলে দিল গলার ভিতরে। মানুষটা উঠে বসল আস্তে আস্তে এবার।

টারজানের পানে সে চাইছে, বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে। অবশেষে মৃদুস্বরে সে বলল, বলল ইংরেজীতেই, "তুমি কে, যেই হও, তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। মৃত্যুর মুখ থেকে তুমি আমায় ছিনিয়ে এনেছ।"

টারজানের একটা দুশ্চিন্তা ছিল এই রকম যে ন্যুমাকে যদিও সে নিজের বক্তব্য বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল, এই মানুষটাকে হয়ত পারবে না। এখন ওকে ইংরেজী বলতে শুনেই কেটে গেল তার সেই দুশ্চিন্তা। "আমার পরিচয় জানতে চাইছ? বেশী কথায় কাজ কী। আমার বাড়ি ইংল্যান্ডে, নাম ক্লেটন। বেশীর ভাগ সময় আফ্রিকাতেই কাটাই, এ-দেশ ভাল লাগে আমার। ইউরোপীয় পোশাক পরি না, কারণ দেশটা দারুণ গরম, এখানে জামা-কাপড় গায়ে রাখা বড়ই কষ্টকর। অন্ততঃ আমার তো খুবই কষ্ট ওতে। তাই আর কি! কেতাদুরস্ত কাপড় অংগে না চড়ালেও যখন ত্রুটি ধরবার মানুষ এখানে কেউ নেই, কিসের জন্যে সইব সে-কষ্ট? এই তো গেল আমার কথা। এখন তোমার পরিচয়–"

এই পর্যন্ত বলেই একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লোকটির পানে তাকিয়ে নিল টারজান–"না, তোমার পরিচয় এক্ষুণি দেওয়ার দরকার নেই। দিতে গেলে কষ্ট হবে তোমার। তবে হ্যাঁ, বলতে পার তোমার নামটি শুধু–"

চটপট জবাব দিল লোকটি–"পল হেস্টর–"

টারজান হেসে বলল–"খাসা নাম। তা বন্ধু হেস্টর, তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি, বেশ কয়েকদিন তুমি এই মহাকান্তারে ঘুরছ। খাদ্য বা জল, পাও নি কিছুই। জল এখন দেদার পাবে, পাশের ঐ ছোট্ট কূপটাতে দুই একদিন এখন যথেষ্ট জল জমবে। কিন্তু বেশী খেও না একবারে। যখনই খাবে, পরিমাণে অল্প। আমি দেখছি, কোনো খাদ্য তোমার জন্য যোগাড় করতে পারি কিনা।"

এই বলেই সে হাসল একটু–"শুধু তোমার জন্য নয়, খাবার তো আমার নিজেরও চাই।"

"এখানে কী খাবার পাবে?"–ক্ষীণ স্বরে প্রশ্ন করল হেস্টর।

"দুই একটা খরগোশ। পাখি ছোট জাতীয়। হরিণ-টরিণ পাওয়া যাবে, এমন আশা করি না। এই খোলা মাঠে তারা চরে বেড়াবে কোন সাহসে? ঐ পাহাড়গুলোর ওপারে আছে বনজংগল। হরিণ থাকে তো ওখানেই আছে। আছে নিশ্চয়ই। ন্যুমা আছেন যখন, তখন তার উদরটি ভরবার ব্যবস্থাও তো নিশ্চয়ই করতে হয়েছে ভগবানকে!"

"হরিণ থাকলেই বা আমাদের কী, না-থাকলেই বা কী!"–নৈরাশ্যের সুরে জবাব দিল লোকটি। "আমরা তো আর নাগাল পাচ্ছি না তার।"

"উপস্থিত ক্ষেত্রে নিশ্চয় পাচ্ছি না। কারণ ন্যুমা ঐ পাহাড়ের উপরেই আছেন। আমি বেশীক্ষণ যদি গরহাজির থাকি এখানে, তিনি আবার দেখা দেবেন তোমাকে। ঐ পাহাড় আর এই মাঠ। এটুকু পথ তার পাঁচ মিনিটও লাগে না পেরুতে।"

আর বাক্যব্যয় না করে টারজান দীর্ঘ পদক্ষেপে রওনা হয়ে পড়ল তার শিকারের অভিযানে। মৃত্যুমুখ থেকে সদ্য-ফেরত মানুষটা তার পানে তাকিয়ে রইল অবাক বিস্ময়ে। এ-রকম একটা মানুষ যে থাকতে পারে পৃথিবীতে, কাল কেউ তাকে বললে সে হেসে উড়িয়ে দিত সেকথা। এর চেহারা রাজা আর্থারের সেরা নাইট স্যার লান্সলটের মত। এর কথাবার্তা যে কোনো সভ্য শিক্ষিত ইউরোপীয় বা মার্কিন ভদ্রলোকের মত। অথচ এ অর্ধোলংগ দেহে অন্ধ আফ্রিকার অরণ্যে কান্তারে বিচরণ করে অকুতোভয়ে, ক্ষুধার্ত সিংহকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয় কোন এক দুর্বোধ্য অজানা ভাষায় ভর্ৎসনা করে। কে এ? আমেরিকায় কোন এক লেখক বই লিখেছেন আফ্রিকার বনজংগল সম্বন্ধে, তাতে এক মহাকপি-পালিত মানবসন্তানের কীর্তি-কাহিনীর অজস্র বর্ণনা আছে। কী ভাল নামটা সেই ছেলেটির? টা-রজান! হ্যাঁ, টারজানই বটে। বর্ণনাগুলোকে ঘটনা বলে মেনে নেওয়া কোন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু হত যদি সম্ভব, নিশ্চয়ই এই কালকালা মাঠের রহস্যময় পুরুষটিকে সেই সব আজগুবি কাহিনীর নায়ক বলে গ্রহণ করা কারও পক্ষেই শক্ত হত না।

[চলবে]

ছবি– নারায়ণ দেবনাথ

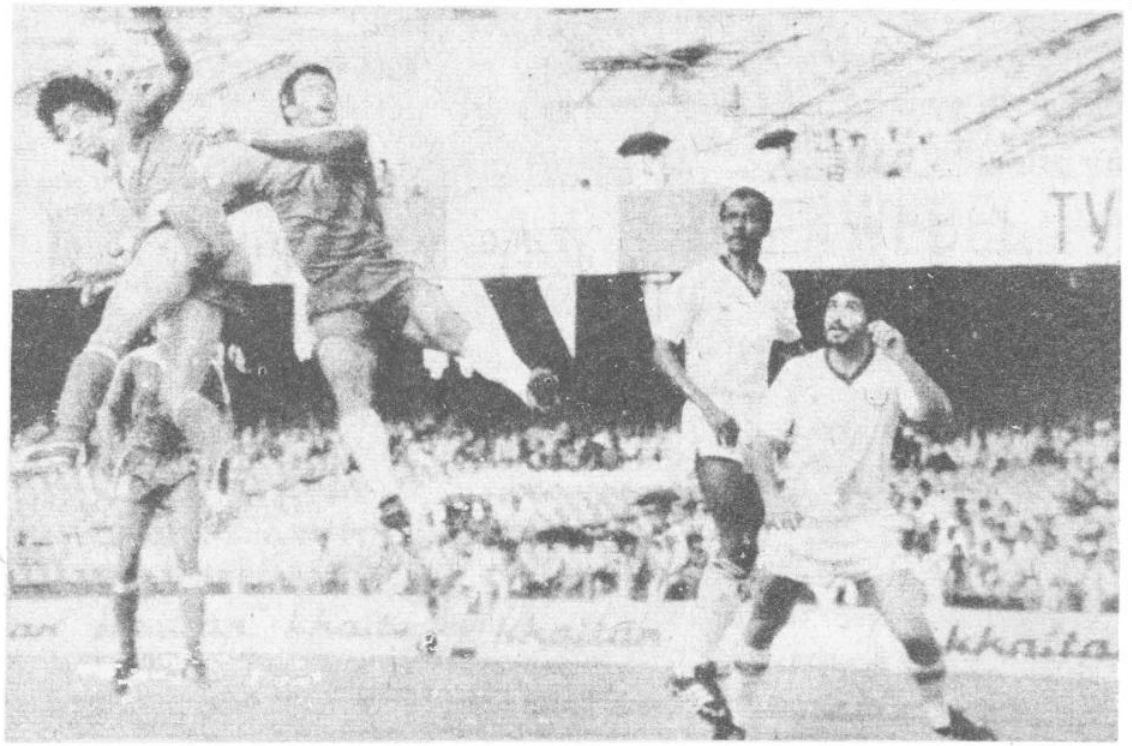

কাতার ইরাকের খেলায় ইরাক গোল করছে

ফুটবল ফুটবল

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের তো এখন দারুণ মজা। এদিকে টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ছে আর ওদিকে মাঠে মাঠে ফুটবল। গলিতে, পার্কে এখন তো শুধু ফুটবল আর ফুটবল। তোমাদের কেউ হয়েছো কৃশাণু, কেউ বিকাশ আবার কেউ প্রশান্ত, কেউ বাবুমানি কিংবা সুব্রত ভট্টাচার্য। খেলাও জমেছে খুব। কেউ মোহনবাগান আবার কেউ ইস্টবেংগল।

বিল্টু-মন্টুদের গলিতে সেদিন হৈ হৈ কান্ড! সন্ধ্যে হতেই আলো জ্বলে উঠলো। গলিতে পিচের রাস্তার ওপরেই দাগ টাগ কেটে ফুটবল মাঠ বানানো হয়েছে। ফুটবল ফাইনাল। অন্য পাড়া থেকে দুটো দল খেলতে আসবে। স্কুলে নন্টে-ভন্টেদের সংগে দেখা হতেই ওদের খেলা দেখতে আসতে বলেছে বিল্টু-মন্টুরা। ওদের খুব সুবিধে। বাড়ির বারান্দায় দিব্যি চেয়ার পেতে বসে খেলা দেখবে।

সেজদাদু বলে দিয়েছেন, খেলার সময় ওরা কেউ যেন নিচে না নামে। বিল্টুর খুব ইচ্ছে ছিলো খেলার সময় গলিতে নেমে বলটল কুড়োবে। কিন্তু তা তো হবার উপায় নেই। শংকরকাকু বলেছেন, আসছে সপ্তাহে খেলা দেখাতে নিয়ে যাবেন। সংগে নন্টে-ভন্টেরাও যাবে। দুদিন যাবে ওরা। একদিন মোহনবাগানের খেলা দেখবে। আর একদিন ইস্টবেংগলের। শংকরকাকুর সংগে প্লেয়ারদের জানা আছে। তাঁদের কাছ থেকেই টিকিট আনেন।

সেজদাদু তো প্রথমে ওদের মাঠে যেতে দিতেই রাজী হন নি। সাফ বলে দিয়েছিলেন, মাঠ এখন একদম বাজে হয়ে গেছে। খেলাও যা তা। ঐ সব খেলা দেখতে আর কষ্ট করে মাঠে যেতে হবে না। শুনে তো বিল্টু-মন্টুদের মুখ চুন। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা-টেষ্টা করে শংকরকাকুই সেজদাদুকে রাজী করিয়েছেন।

তাই বিল্টু চুপচাপ বারান্দায় বসে আছে। নামার সাহস নেই। নামলে সেজদাদু রেগে যাবেন। তাহলে আর

খেলা দেখতে যাওয়া হবে না। ওরা সেই ভয়েই তো চুপচাপ আছে। এমনিতেই সেজদাদু রেগে আছেন। বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রাথমিক পর্যায়ের লীগের খেলায় ভারত ভালো খেলতে পারে নি। বাংলা জাতীয় ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে হেরেছে। এই সব নিয়ে ওঁর খুব রাগ।

তবে ক্রিকেটের কথা বললেই মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। খুশি খুশি গলায় বলেন, একদিনের ক্রিকেটে ভারত যে এখন এক নম্বর দল এ বিষয়ে আর কেউ কিছু বলতে পারবে না। ১৯৮৩ সালে ভারতের বিশ্বকাপ জয়ে যাঁরা হেসেছিলেন, বলেছিলেন, গ্রেটেস্ট ফ্লুক অফ দা ক্রিকেট হিস্ট্রি–এবার তাঁদের মুখের ওপর জবাবের মতো জবাব দিয়েছে ভারত। অস্ট্রেলিয়ায় জিতেছে বেনসন হেজেস কাপ আর তারপর শারজায় রথম্যান ক্রিকেটে জিতে ভারত প্রমাণ করেছে যে একদিনের ক্রিকেটে ভারতই বিশ্বশ্রেষ্ঠ।

কিন্তু ফুটবলে ! ভারত নামছে তো নামছেই। ভারত একদিন এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন ছিলো, ওলিম্পিক ফুটবলে চতুর্থ স্থান পেয়েছিলো–এ কথা তো আমরা ভুলেই

শক্তি মিত্র বল নিয়ে এগোচ্ছেন

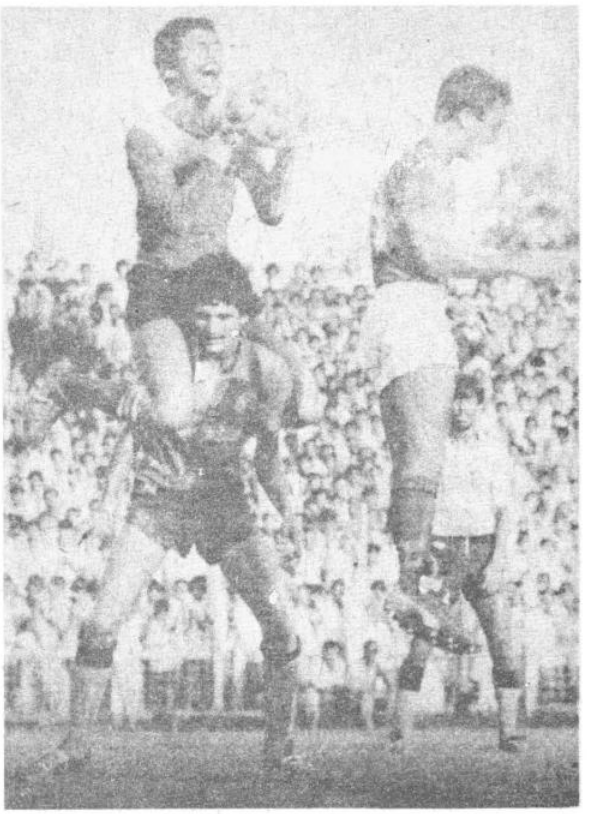

বাবু মানি (পেছন ফিরে) গোল করতে পারলেন না

গেছি। এখন আমরা থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়ার মতো দলকেও হারাতে পারি না। এর থেকে লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে।

সেজদাদু বলেন, যুগোশ্লাভিয়ার জাতীয় কোচ চিরিচ মিলোভানকে যখন ভারতে আনা হয়েছিলো তখন ওঁর হাতে ১৫-১৬ বছরের তরুণ কিছু খেলোয়াড়কে তুলে দিলে হয়তো তিনি ভারতীয় ফুটবলকে বেশ খানিকটা এগিয়ে দিয়ে যেতে পারতেন। ভারতীয় ফুটবলের তাতে উপকারই হতো। সেজদাদু তো সেই কথাই বলেন। বলেন, মিলোভান সাহেব খুব নামকরা আর দক্ষ কোচ। ওঁর জন্যেই ভারত কলকাতার নেহরু কাপে আর্জেনটিনা, পোলাণ্ডের মতো দলের সঙ্গে সমান তালে লড়তে পেরেছিলো।

তার কারণ তখন ভারতীয় খেলোয়াড়রা মিলোভানের কথা শুনেছিলেন। তাঁর কথা মতো জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে ভারতীয়

ফুটবলের সেই রূপ আর দেখা যায় নি। আসলে মিলোভান সাহেবের হাতে যে সব খেলোয়াড়দের তুলে দেওয়া হয়েছিলো তাদের বেশি কিছু শেখাবার ছিলো না। কিন্তু ছোটদের, উদীয়মান খেলোয়াড়দের হাতে পেলে মিলোভান সাহেব হয়তো দারুণ কিছু করে যেতে পারতেন।

সেজদাদু তো সেই কথাই বলেন। বলেন, ছোট ছেলেদের হাতে পেলে মিলোভান হয়তো ঐভাবে ভারত ছেড়ে চলে যেতেন না। হয়তো সত্যিকারের শক্তিশালী ফুটবল দল আমাদের হাতে তুলে দিয়ে যেতেন।

তাই আজকাল ফুটবল খেলার নামে সেজদাদু ভীষণ রেগে যান। শংকরকাকু অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে খেলা দেখতে যাবার ব্যবস্থা করেছেন। নিচে নেমে সেই সুযোগ হারাতে চায় না বিল্টু-মন্টুরা। ওরা তাই নন্টে-ভন্টেদের সংগে বসে আছে দোতলার বারান্দায়। ওখান থেকেই খেলা দেখবে।

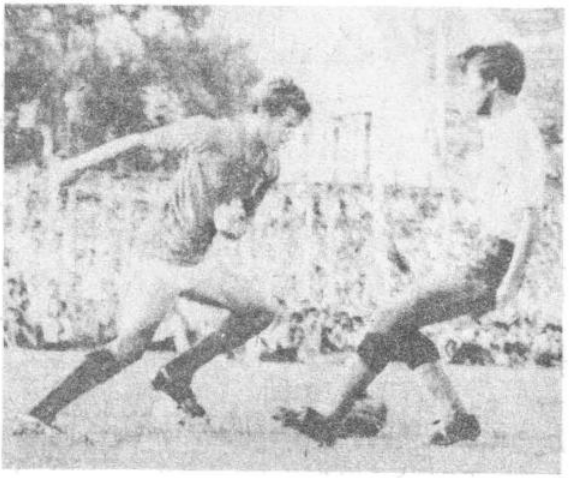

বিকাশ পাঁজি বল কাড়ছেন

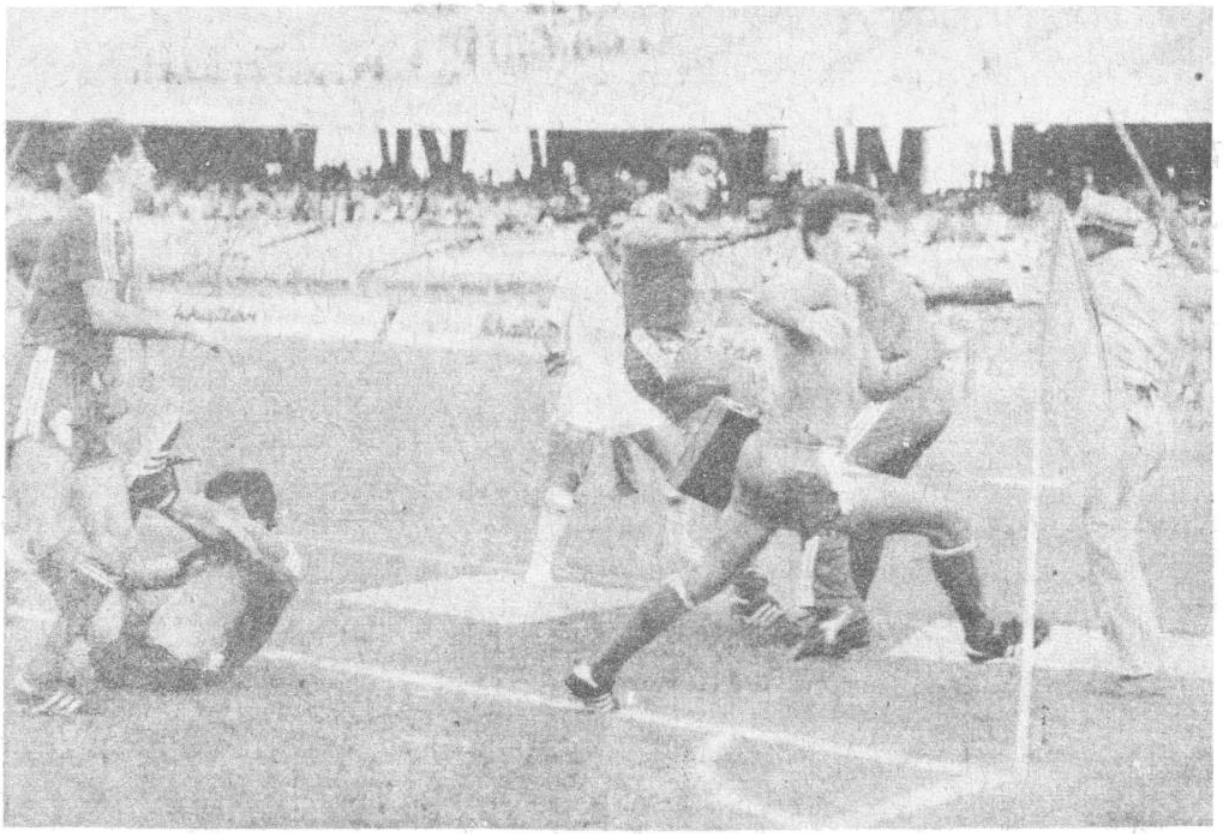

শক্তি ও সামর্থ্য

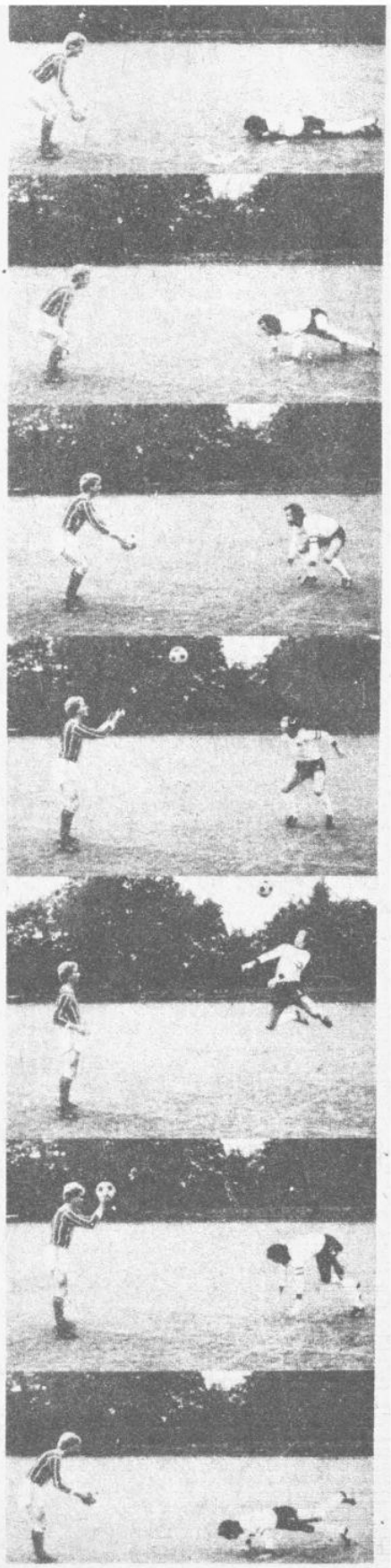

[ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ার এবার তোমাদের শেখাচ্ছেন ভালো ফুটবল খেলার গোপন কথা। ভালো খেলতে হলে শক্তি ও সামর্থ্যের দরকার সব থেকে বেশি। এবার তিনি সেই কথাই বলছেন]

এক একজন মানুষ এক এক রকম। ঠিক মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। একজন যে জিনিসটা পছন্দ করছেন অন্যজনের হয়তো সেটা ভালোই লাগছে না। তা সে খাওয়া দাওয়া থেকে আরম্ভ করে সব ব্যাপারেই। ফুটবল খেলার ব্যাপারেও তাই। কারো হয়তো ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের মতো খেলাই ভালো লাগে। তাঁরা ব্রাজিলী শৈল্পিক ফুটবল পছন্দ করেন। পছন্দ করেন ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের কারসাজি আর নিত্যনতুন খেলার ধারা বদলানোর পন্হাকে। আর একদল আছেন যাঁরা সব সময় পরিকল্পনা মাফিক খেলা পছন্দ করেন। তাঁরা বসে বসে কোচদের সঙ্গে পরিকল্পনা মাফিক খেলার বিষয় আলোচনা করেন।

যাই হোক তোমরা যদি ভালো ফুটবল খেলতে চাও তাহলে একটা কথা তোমাদের মনে রাখতে হবে যে ফুটবল এমন একটা খেলা যার জন্যে দরকার লড়াকু মনোভাব। শরীরের সব শক্তি ও সামর্থ্য উজাড় করে দিয়ে খেলার সময় ছুটতে হবে, লাফাতে হবে, বল মারতে বা হেড দিতে হবে। চোট পাবার ভয় কাটিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়ের মুখোমুখি হতে হবে। এইজন্যে শরীরের সব মাংসপেশী সবল ও সুস্হ রাখার দরকার।এইজন্যে কয়েকটি ব্যায়াম করতে হবে। তোমবা যারা ভালো ফুটবল খেলতে চাও তারা কোর কিন্তু।

এবার কি কি ব্যায়াম কিভাবে করতে হবে সেই কথাই বলি।

(১) দু'জন খেলোয়াড় মিলে ব্যায়াম করতে হবে। একজন উপুড় হয়ে শুয়ে পডবে। অন্যজন থ্রো করার মতো করে বলটা তার দিকে ছুঁড়ে দেবে। তখন খেলোয়াড়টি চকিতে উঠে বলটি হেড দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে আবার আগের মতো শুয়ে পড়বে।

বাঁদিকের পাতায় সরু ছবিগুলি ওপর থেকে নিচে দেখো তাহলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। ঐ ভাবে বার দশেক করার পর জায়গা বদল করবে। তখন তোমার সঙ্গী শুয়ে থাকবে আর তুমি বল ছুঁড়বে। এতে তোমার গতি বা স্পিড বাড়বে, বাড়বে তৎপরতা আর শরীরের মাংসপেশীগুলিও শক্ত-সমর্থ হয়ে উঠবে।

(২) 'মেডিসিন বল' কথাটা শুনেছো ? দেখতে সুন্দর, একটু বড় আর ওজন দশ পাউন্ডের মতো। নিচের ছবিটা দেখো। শুয়ে পড়ো। পূর্বের মতো বলটা দু হাতে ধরো আর মাথার পেছনে নিয়ে যাও। পা ছড়ানো। শরীরটাকে তুলতে তুলতে বলটা হাঁটুর কাছে আনো। পা, কিন্তু মাটি স্পর্শ করবে না। ছবির মতো করে দশ বারোবার এই ব্যায়ামটা করলে দেখবে পেটের মাংসপেশীগুলো কতো সবল হয়ে উঠবে।

(৩) এটা না পারলে আর একটা ব্যায়াম করতে পারো। ছবির (একদম নিচের) মতো করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো। মেডিসিন বলটা ছবির মতো করে একবার তোল আবার নামাও। পায়ের অবস্হা কেমন হবে দেখে নাও।

(৪) এবার বলি 'হর্স অ্যান্ড রাইডার' ব্যায়ামের কথা। তোমার সঙ্গীকে পিঠে তুলে তুমি গোল লাইন থেকে সেন্টার পর্যন্ত ছুটে এসো। যতোটা পারবে জোরে ছুটবে। হাঁটবে না কিছুতেই। এর পর সেন্টার থেকে গোল লাইন পর্যন্ত তোমার সঙ্গী তোমায় পিঠে নিয়ে দৌড়বে।

(৫) সঙ্গীকে পিঠে নিয়ে বল খেলতে শুরু করো। বল কনট্রোল করার চেষ্টা করো ছুটতে ছুটতে।

এই ব্যায়াম কটা করলে দেখবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তোমবা শারীরিক সক্ষমতার দিকে দিয়ে দারুণ উন্নতি করে ফেলেছো।

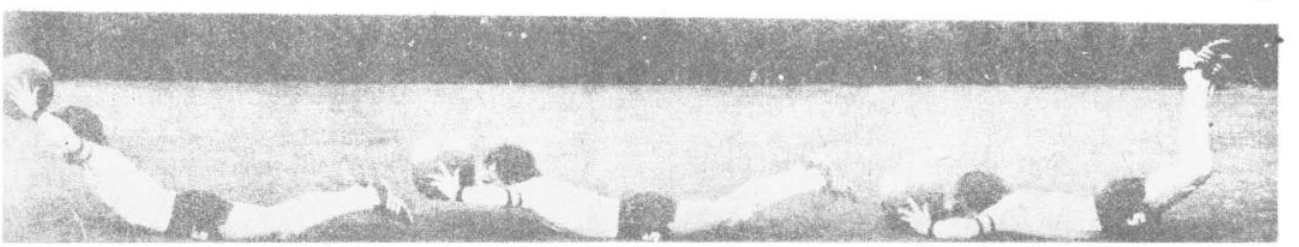

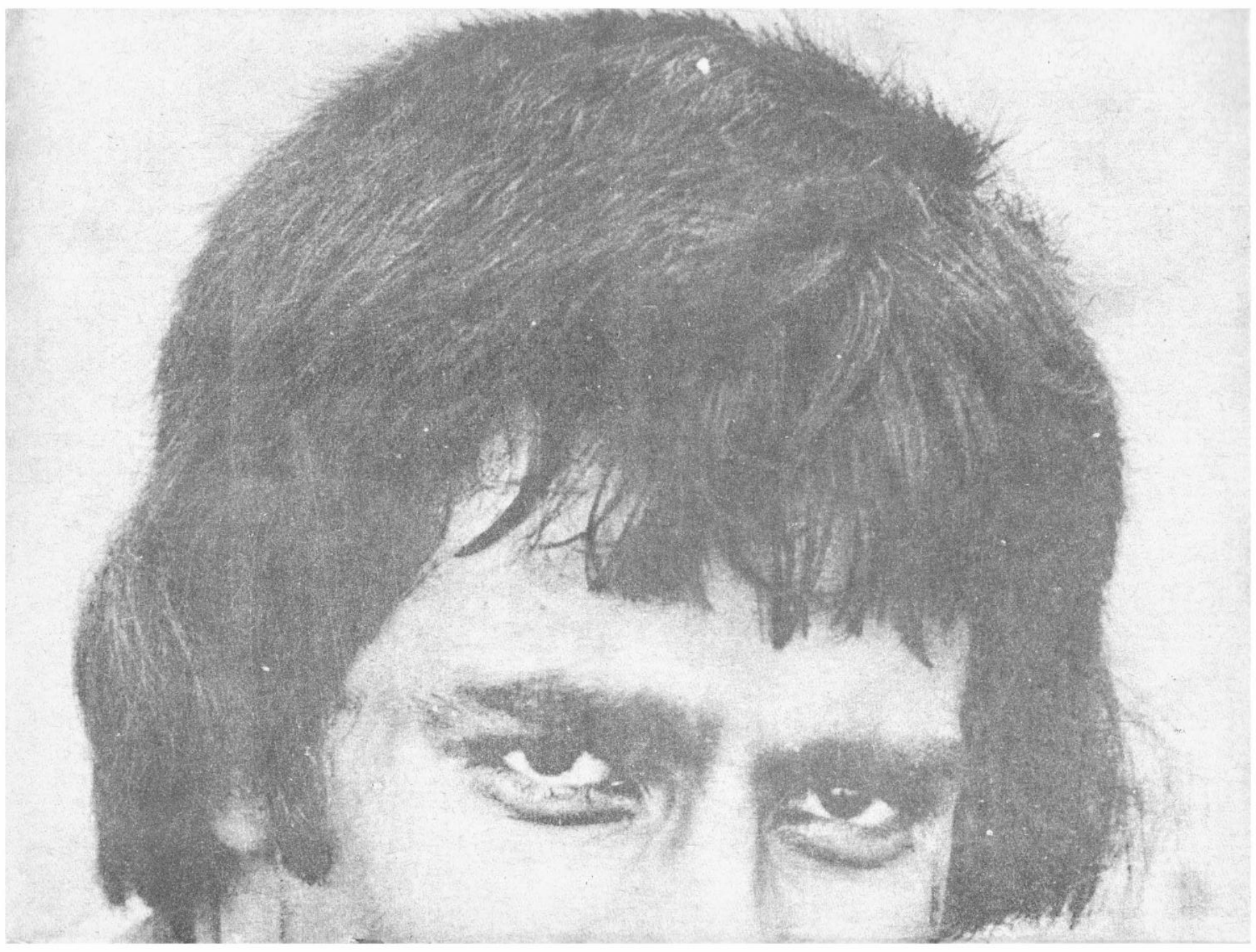

প্রশ্ন ঃ

(১) বিশ্বকাপ ফুটবল কোন সালে শুরু হয় ?

(২) প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে বদলী খেলোয়াড় নেবার প্রথা কোন বছর থেকে চলছে ?

(৩) মহম্মদ আলির আগের নাম কী ছিলো ?

(৪) ক্রিকেট পিচের দৈর্ঘ্য কতো ?

(৫) প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রথম উইকেটের রেকর্ড গড়েছেন কে কে ? কোন সালে ? তাঁরা কার রেকর্ড ভাঙেন ?

(৬) কোন দেশ প্রথম চারজন সত্যিকারের ফাস্ট বোলারকে দলে নিয়ে টেস্ট খেলতে নেমেছিলো ? কার বিরুদ্ধে ? কোন সালে ?

(৭) টেস্ট খেলায় একদিনে সব থেকে বেশি রানের নজির কি ?

(৮) ওলিম্পিকের সাঁতারে সোনা জয়ী এক সাঁতারু টারজানের ভূমিকায় অভিনয় করে দারুণ নাম করেছেন। তাঁর নাম কি ?

(৯) এশিয়ার কোন্ মহিলা প্রথম সাঁতার কেটে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছেন–তার নাম কী ?

(১০) ক্রিকেটে 'বিগ ক্যাট' কাকে বলা হয় ?

(১১) ভারতীয় ফুটবলে 'চাইনিজ ওয়াল' কাকে বলা হয় ?

(১২) ফাদার অফ ক্রিকেট কাকে বলা হয় ?

(১৩) ভারতীয় ফুটবলের জনক কাকে বলা হয় ?

স্পোর্টস কুইজ

উত্তর ঃ

(১) ১৯৩০ সালে।

(২) ১৯৬৫ সাল থেকে।

(৩) ক্যাসিয়াস ক্লে।

(৪) বাইশ গজ।

(৫) ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে করাচিতে এই রেকর্ড গড়েন ওয়াহিদ মির্জা (৩২৪) ও মনসুর আখতার (২২৪) প্রথম উইকেটের অভংগ জুটিতে ৫৬১ রান করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়েন। তাঁরা ভাঙেন ইয়র্কশায়ারের হারবার্ট সাটক্লিফ ও পার্সি হোমসের ৫৫৫ রানের রেকর্ড। ১৯৩২ সালে ওঁরা ঐ রেকর্ড গড়েছিলেন।

(৬) ১৯৭৬ সালে হেডিংলে টেস্টে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজ হোল্ডার, হোল্ডিং, অ্যান্ডি রবার্টস ও ড্যানিয়েলকে খেলতে নামিয়েছিলো।

(৭) ১৯৭৪ সালের ১৫ মে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে সব থেকে বেশি রান–৫৮৮ রান উঠেছিলো। ইংলন্ড আগে ব্যাট করে ৩৯৮ রান করেছিলো। ভারত পরে ব্যাট করতে নেমে করেছিলো বিনা উইকেটে ১৯০ রান।

(৮) জনি ওয়েজমুলার।

(৯) আরতি সাহা।

(১০) ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েডকে।

(১১) গোষ্ঠ পালকে।

(১২) ডব্লিউ. জি. গ্রেসকে।

(১৩) নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে।

ক্রিকেটের লর্ড ব্লাইভ

(তিন)

ধরা পড়ে গেলো ব্লাইভ।

সেদিন রাত্তিরে বাড়ি ফিরে চা খেতে খেতে বাবা বললেন, বইখাতা নিয়ে আয় তো ব্লাইভ–দেখি কেমন পড়াশোনা হচ্ছে।

ব্লাইভ তখন শোয়ার তোড়জোড় করছিলো। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। এখন ঘুমিয়ে পড়লেই দিনটা কেটে যায়। কিন্তু তা আর হলো কই?

বাবার কথা শুনে চমকে উঠলো সে। বইখাতা আছে ঠিকই। কিন্তু বই কোনোদিন উল্টোয় নি। খাতায় একটি আঁচড়ও পড়েনি। স্কুলে না গেলে পড়বেই বা কি করে। ঐ সব নিয়ে বাবার সামনে গেলে আর দেখতে হবে না। এদিকে বাবার ডাক উপেক্ষা করার সাহসও ওর নেই।

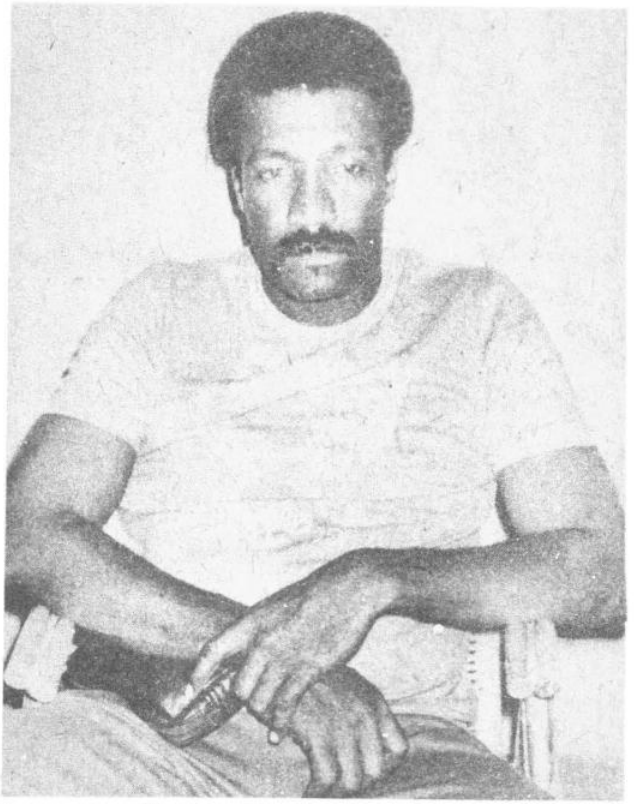

কিন্তু এবার কী করবে?

প্রথমটায় ভাব করেছিলো, যেন বাবার কথা শুনতেই পায় নি। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। চায়ের কাপটা সরিয়ে রেখে বাবা আবার ডাক দিলেন, কই রে ব্লাইভ–তোর বইখাতা নিয়ে আয়। দেখি স্কুলে কি রকম পড়টড়া হচ্ছে।

আর কোনো উপায় নেই। এবার বাবার কাছে মার খেতেই হবে। ব্লাইভের মুখ শুকিয়ে চুন। কী যে করবে ভেবেই পাচ্ছে না। বইখাতাগুলো গোছাতে গোছাতে ভাবছিলো সেইদিনের কথা। ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে একবেলা ছুটি নিয়ে এসে বাবা ওকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেন্ট অ্যামব্রোজ প্রাইমারি স্কুল। স্কুলটা ভালোই। ছোটরা চটপট সব শিখে যায়। কিন্তু ব্লাইভ তো স্কুলেই যায় না। ও কিছু শিখবে কি করে। সারাদিন ধরে শুধু ক্রিকেটই খেলেছে।

কিন্তু এবার কী হবে? বইখাতা নিয়ে একরকম কাঁপতে কাঁপতে বাবার সামনে এসে হাজির হলো ব্লাইভ।

বই উল্টে, খাতা খুলে লয়েড সাহেব রেগে আগুন। উনি ভাবতেও পারেন নি স্কুলে না গিয়ে ব্লাইভ সারাদিন খেলে বেড়ায়। গরিব ঘরের ছেলে। কোথায় লেখাপড়া

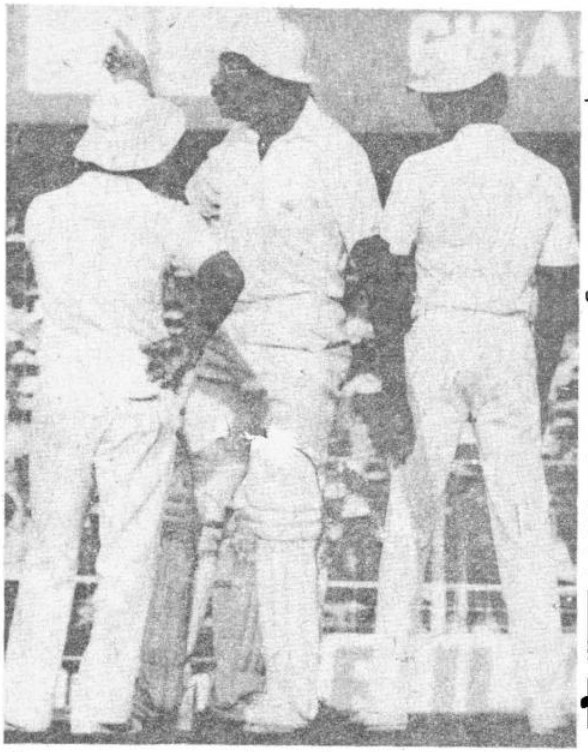

সুনীল গাভাসকর ও অংশুমান গায়কোয়াড়কে কিছু বোঝাচ্ছেন ক্লাইভ লয়েড

শিখে মানুষ হবে। চাকরি বাকরি জুটিয়ে নিয়ে ওঁর পাশে দাঁড়াবে–তা না সারাদিন শুধু খেলা আর খেলা। শুধু খেললেই কি চলবে ?

লেখাপড়াটাও তো করতে হবে।

ঠিক হলো পরদিন সকালে তিনি নিজে ক্লাইভকে নিয়ে যাবেন স্কুলে। তার পরদিন থেকে ক্লাইভ তার মার সঙ্গে স্কুলে যাবে। একটু আগে আগেই যাবে। মা কাজের বাড়ি যাবার পথে ওকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে যাবেন।

পরদিন সকালে ভোরবেলায় তাকে ঘুম থেকে তুলে পড়তে বসিয়ে দিলেন লয়েড সাহেব। বললেন, বই ছেড়ে উঠলে পিঠের ছাল তুলে দেবেন।

বই নিয়ে বসে আছে ক্লাইভ। ওঠার সাহস নেই। বাবা মাকে বলে গেলেন, বই ছেড়ে উঠলেই মারবে। কী আর করে ক্লাইভ । বসে বসে দেখছে। কলিন এসে ক'বার ঘুরে গেছে। হেক্টর ঘুরপাক খাচ্ছে। ল্যান্স এসেও উঁকি মেরেছে। মাসী বাড়ি আছে দেখে আর ঢুকতে সাহস পায় নি।

ল্যান্সকে দেখে খুশি হয়েছিলো ক্লাইভ। ভেবেছিলো, ল্যান্স বাড়ি এলে খেলা না হোক একটু গল্প করা যায়। ল্যান্স ওর মাসতুতো দাদা। ক্লাইভের মা বার্বাডোজের মেয়ে। কিছুদিন আগে মাসীও বার্বাডোজ থেকে চলে এসেছেন। সঙ্গে ছেলে ল্যান্স গিবস। গিবস লয়েডের চেয়ে বছর দশেকের বড়। রোগা টিংটিঙে চেহারা। কিন্তু বলটা দারুণ করে। গিবসের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া বলগুলো মাটিতে পড়ে অনেকখানি করে ঘুরে যায়। ল্যান্সদাদা আসায় ক্লাইভের খুব সুবিধে হয়েছিলো। দুজনে একসঙ্গে বেড়াতো খেলতো। কিন্তু সেদিন মাসীর বাড়িতে উঁকি দিয়ে ক্লাইভকে বইখাতা নিয়ে বসে থাকতে দেখেই ল্যান্স বুঝেছিলো, গতিক সুবিধের নয়। তাই কেটে পড়েছে।

গিবসদাদা ভালোই খেলে। জর্জটাউনের সব থেকে বড় ক্লাব ডেমেরারা। ল্যান্স গিবস এখন সেখানে খেলছে। ক্লাইভ একটু বড় হলে ল্যান্স তাকে সেখানে খেলতে নিয়ে যাবে বলেছে।

কথাটা মনে হতেই আবার মন খারাপ হয়ে গেলো ক্লাইভের। ওর খাওয়া হয়ে গেছে। বইখাতা নিয়ে মার সঙ্গে স্কুলের পথ ধরলো। পেছন ফিরতেই দেখলো, কলিন, হেক্টর আর ল্যান্স ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বইখাতার সঙ্গে ক্লাইভ সেই ভারি ব্যাটটাও বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্কুলে সময় পেলেই খেলবে। ল্যান্সদের আপত্তি ছিলো ঐ ব্যাপারেই। ওরা খেলবে বলে ব্যাটটা চেয়েছিলো ক্লাইভ দেয় নি। ও খেলতে পারবে না–ওরা মজা করে খেলবে। এ কখনো সহ্য করা যায়।

স্কুলে যেতে যেতে ক্লাইভ ভাবছিলো, কবে যে ও বড় হবে। কেউ তখন সারাদিন খেললেও বকবে না। তখন আর স্কুলে যাবার হাঙ্গামা থাকবে না। ক্লাইভ সেইদিনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। যাক গে, এখন থেকে তো রোজ স্কুলে যেতে হবে। স্কুলেই খেলবে এবার থেকে।

কিন্তু ঐ রকম যে কোনো ঘটনা ঘটে যাবে তা কেউ ভাবে নি। রোজ স্কুল থেকে ও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে। কোনো রকমে বইখাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসে যায় খেলতে। একটুও দেরি সহ্য হয় না ওর। তাই স্কুলে ছুটির ঘন্টা পড়লে ও একরকম ছুটতে ছুটতেই বাড়ি আসে।

সেই দিনও তাই আসছিলো। বড় তাড়া ওর। বাড়ি যেতে যেতেই খেলা আরম্ভ হয়ে যাবে। তাহলে আর ওকে খেলতে নেবে না। ব্যাট অবশ্য ওর হাতেই আছে। তাতে কী ! তাই একরকম ছুটছিলো ক্লাইভ।

কিন্তু ও কী।

থমকে দাঁড়ালো ক্লাইভ। ওরই বয়সী দুটি ছেলে মারামারি করছে। ওসব ক্লাইভ একদম পছন্দ করে না। ও এগিয়ে গেলো থামাতে। কেন দুটি ছেলে ঐরকম মারামারি করবে। দুটি ছেলেই রাগে ফুঁসছিলো। কেউ পিছু হটতে চায় না। ওরা মারামারি করবেই। ওদের মধ্যে

ক্লাইভকে দেখে ওরা রেগে গেলো। একজনের হাতে একটা রুলার ছিলো। রাগের চোটে সেইটাই বসিয়ে দিলো ক্লাইভের মুখে। লাগলো ডান চোখে। বেশ জোরেই লাগলো।

উঃ–কাতরে উঠলো ক্লাইভ। বড্ড লেগেছে। বড্ড কষ্ট হচ্ছে। হাত দিয়ে চোখ চেপে ছুটতে ছুটতে বাড়ি এলো। চোখে বেশ যন্ত্রণা। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিলো। যন্ত্রণা কমানোর ওষুধ খেলো। তখনকার মতো সামলে নিলো ক্লাইভ। কিন্তু আঘাত যে কতোটা ক্লাইভ তা কল্পনাও করতে পারে নি।

এর পর থেকে ঝামেলা। খেলতে গিয়ে বলগুলো ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছে না ক্লাইভ। স্কুলে ব্ল্যাকবোর্ডে স্যাররা কি লিখছেন তা **পরিষ্কার** দেখতে পাচ্ছে না। মাস্টারমশাইকে বলে সামনের বেঞ্চে এসে বসলো। খেলতে গিয়ে বিপদে পড়ছে সে। যে বলগলো সে সহজেই বাউন্ডারি হাঁকাতো, ওভার বাউন্ডারি করতো, সেই বলগুলো সে মারতেই পারছে না। কখনো এল. বি. ডব্লিউ. হয়ে যাচ্ছে। কখনো বোল্ড। খুব অবাক হয় ক্লাইভ। সে কী তাহলে চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছে না।

ক্লাইভ সেদিন রাত্তিরে মাকে বললো, মা আমি ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছি না, স্কুলে বোর্ডে লেখা পড়তে কষ্ট হচ্ছে।

সে আবার কী!

মা তাড়াতাড়ি বাবাকে বললেন। বাবা পরদিনই ক্লাইভকে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি **ক্লাইভের** কাছে শুনলেন কী হয়েছিলো। তারপর এক চোখের ডাক্তারের কাছে ওকে চিঠি লিখে পাঠালেন।

তিনি ভালো করে দেখে ভাবলেন, ছোট্ট ছেলে,হয়তো ওষুধেই ঠিক হয়ে যাবে। তাই প্রথমটায় ওষুধ দিয়ে চেষ্টা করলেন। হলো না। **ক্লাইভের** দৃষ্টিশক্তি এতোটুকুও বাড়লো না। আগের মতোই খেলতে গিয়ে ও আউট হতে লাগলো। বোর্ডের লেখাও পড়তে কষ্ট হয়।

ডাক্তারবাবু তখন চশমা দিলেন।

চশমা পরেই মুশকিল আসান। দিব্যি আবার দেখতে পাচ্ছে। কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। খেলতে নেমে আউট হচ্ছে না। বাউন্ডারির পর বাউন্ডারি হাঁকাচ্ছে। ঠিক আগের মতো। স্কুলে ব্ল্যাকবোর্ডেও মাস্টারমশাইদের লেখা পড়তে আর কষ্ট হচ্ছে না। এবার থেকে ক্লাইভ তাহলে চশমা পরেই সব কিছু করবে।

হাসি ফুটে ওঠে ক্লাইভের মুখে...

[চলবে]

তোমাদের ??? জিজ্ঞাসা

রণজয় ঘোষ (সাউথ পয়েন্ট স্কুল)

প্রশ্নঃ একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সব থেকে বেশি সেঞ্চুরি করার রেকর্ড কার?

উত্তরঃ দু'জনের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভিভিয়ান রিচার্ডস আর পাকিস্তানের জাহির আব্বাসের। দু'জনেই সাতটি করে সেঞ্চুরি করেছেন।

সুবিনয় ব্যানার্জী (গড়িয়াহাট রোড, সাউথ, কলকাতা-৩১)

প্রশ্নঃ চেতন চৌহান টেস্ট খেলায় ক'টি সেঞ্চুরি করেছেন। ওঁর টেস্ট খেলার রেকর্ড জানতে চাই।

উত্তরঃ চেতন চৌহান ৪০টি টেস্ট খেললেও সেঞ্চুরি করতে পারেন নি একটিও। তিনি মোট ২০৮৪ রান করেছেন। ইনিংস প্রতি গড় হিসেব ৩১.৫৭।

স্বপনকুমার নন্দী (জামশেদপুর)

প্রশ্নঃ কোন দেশ কোন সাল থেকে টেস্ট খেলছে?

উত্তরঃ ইংলন্ড–১৮৭৭
অস্ট্রেলিয়া–১৮৭৭
ওয়েস্ট ইন্ডিজ–১৯২৮
নিউজিল্যান্ড–১৯৩০
ভারত–১৯৩২
পাকিস্তান–১৯৫২
শ্রীলংকা–১৯৮২

দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের বর্ণবিদ্বেষী নীতির জন্যে এখন টেস্ট খেলতে পায় না বা কেউ তাদের সঙ্গে খেলে না। তবে টেস্ট ক্রিকেটের আসরে তাদের আবির্ভাব ইংলন্ড-অস্ট্রেলিয়ার পরেই ১৮৮৯ সালে।

আশীষ ভদ্রের সঙ্গে কিছুক্ষণ

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের ফুটবল অধিনায়ক আশীষ ভদ্রর খেলার প্রশংসা দেখেছিলাম। সল্ট লেকে ভারত-বাংলাদেশ প্রীওয়ার্ল্ডকাপের শেষ ম্যাচটিতে ওর খেলা খুব ভাল লাগল। বাংলাদেশ দলকলকাতায় আসার দিন রাত্রেই হোটেলে আশীষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু মুখোমুখি হলাম ভারত বাংলাদেশ ম্যাচের পরের দিন বিকেলে এয়ারপোর্ট হোটেলের সুইমিং পুলের ধারে। প্রথমেই ওকে অভিনন্দন জানালাম আগের দিনের ম্যাচে সুন্দর গোলটি করবার জন্য। বিনয়ী আশীষ নম্রভাবে বলল।

জানেন ছেলেবেলায় কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি ফুটবলার হবো। স্কুলে পড়ার সময় আর পাঁচজনের মতোই ফুটবল খেলতাম। ভাল লাগত তাই। তবে আমার খেলা অনেকের ভাল লাগত। খেলার জন্য বাড়িতে বকুনিও খেয়েছি অনেক। ম্যাট্রিক পাশ করার পর চট্টগ্রামের সেকেন্ড ডিভিসনের একটা দলে খেলতাম। সেখানে খেলতে খেলতেই একদিন হঠাৎ ন্যাশানাল-এ খেলার সুযোগ পাই। ন্যাশানালে আমার খেলা দেখে ঢাকার রহমদগঞ্জ ক্লাব আমায় তাদের দলে খেলবার জন্য অফার দেয়। আমি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় গিয়ে আস্তে আস্তে ফুটবলের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে শুরু করি। রহমদগঞ্জ-এ ভাল খেলায় ঢাকার সেরা ক্লাব আবহনি ক্রীড়াচক্র থেকে ডাক পাই। ওখানে খেলতে খেলতেই আমি ফুটবলার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠলাম। সাফল্য আসতে থাকল ক্রমাগত। ১৯৭৮ সালটা আমার কাছে চিরস্মরণীয়। কারণ ঐ বছরই আমি প্রথম দেশের হয়ে খেলবার সুযোগ পাই। এখনো মনে পড়ে সেই দিনটার কথা। আমরা তখন কোচিং ক্যাম্পে, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছি, রাত ১২টা নাগাদ আমার এক বন্ধু এসে আমায় সুসংবাদটি জানায়। সেই মুহূর্তে নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ বলে মনে হয়েছিলো।

ভারত-বাংলাদেশ ফুটবল সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে ও বলে, দেখুন ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তান আমার মতে এশিয়ার ফুটবল দলগুলির মধ্যে সব থেকে পিছিয়ে রয়েছে। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে তুলনা করলে আমার মতে ভারত অনেক ব্যালান্সড্। তবে ভারতের তুলনায় আমরা অনেক ফাস্ট। ভারতের কৃশাণু, অতনু, তরুণ, প্রশান্ত ও ভাস্করের খেলা আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার মনে হয় ভারত ও বাংলাদেশে ফুটবলে উন্নতি করতে হলে সাধারণ গড়পেটা নিয়ম বন্ধ করতে হবে। ফুটবলে প্রফেশনালিজম্ চালু করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। জুনিয়র প্লেয়ারদেরকে কয়েক বছর ধরে একটানা ভাল প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ দিতে পারলে নিশ্চয় ভালো ফল পাওয়া যাবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কলকাতার টিমে খেলার সুযোগ পেলে কী করবেন।

একথার উত্তরে হো হো করে হেসে উঠলেন আশীষ, কী বললেন, কলকাতায় খেলব কিনা? যেখানে এত বড় বড় প্লেয়ার রয়েছে সেখানে আমার মতো একজন ফুটবলারকে কে চান্স দেবে ? তবে সুযোগ এলে নিশ্চয় ভেবে দেখবো।

প্রশ্ন করলাম, আপনার জীবনের সেরা ম্যাচ কোনটি ?

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে আশীষ —

জানেন এখনো পর্যন্ত এমন একটা ম্যাচও খেলিনি যেটাকে জীবনের সেরা ম্যাচের স্বীকৃতি দেওয়া যায়। তবে সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছিলাম আর্জেন্টিনার একটি দলের বিপক্ষে খেলে। খেলায় গোল করতে পারলে সব থেকে আনন্দ পাই আমি। কথাগুলো বলে আশীষ থামলেন। হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন, এইবার উঠি, এক্ষুণি পার্টিতে যেতে হবে।

আমরা একসঙ্গে উঠলাম। আশীষ আমার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, দাদা, একবার আসুন না আমাদের দেশে। বললাম, নিশ্চয় যাবো সুযোগ পেলে।

শান্তনু ব্যানার্জী

এই সংখ্যার সব ছবি ও শিল্পীদের প্রচ্ছদের রঙিন ছবি তুলেছেন সুমন চট্টোপাধ্যায়

অলৌকিক

কমল লাহিড়ী

চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাটের কাছে একটি ছোট্ট গ্রাম–কাঁকড়াকচুয়া। এই গ্রামেরই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ছেলে লোকনাথ। বাবা রামকানাই ঘোষালের ইচ্ছে ছিল তাঁর একটি ছেলেকে সন্ন্যাসী করবেন। কিন্তু মা কমলাদেবী প্রথমে কিছুতেই রাজী হন নি। তবে লোকনাথ জন্মাবার পরই কমলাদেবী রামকানাই ঘোষালকে বললেন, আগের তিনটি ছেলেকে তো তোমার কথামত মত দিতে পারিনি, এই ছেলেকে তুমি সন্ন্যাসী করে দিও।

ছোটবেলার সেই কথাটা একটু বড় হওয়ার পর লোকনাথও জানতে পারে। পাড়া-প্রতিবেশী থেকে শুরু করে আত্মীয়-পরিজন সবাই লোকনাথকে সাধু হয়ে যাওয়ার কথাই শোনায়। সবার কথা শুনে শিশু লোকনাথ শুধু হাসে।

লেখাপড়া মন দিয়ে করলেও দুষ্টুর শিরোমণি হয়ে ওঠে সে। সেদিন তো এক কাণ্ডই করে বসে। গ্রামের বয়স্করা মিলে ঘেঁটুপূজা শেষ করে সবাইকে প্রসাদ দিয়ে যার যার বাড়িতে চলে গেছেন। চঞ্চল লোকনাথ তার খেলার সাথীদের নিয়ে দূর থেকে সবই দেখছিল। বয়স্ক লোকেরা চলে যেতেই লোকনাথ বলে, এই আয় একটা মজা করি।

লোকনাথ সামনের জঙ্গল থেকে একটা গাছের মোটা ডাল ভেঙে নেয়, তারপর দৌড়ে গিয়ে পুজো করা সেই মাটির ঘন্টাকর্ণ ঠাকুরকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে থাকে। অন্য বন্ধুরা ভয়ে কাঁটা। লোকনাথ ততক্ষণে নির্বিকারভাবে ঘেঁটু ঠাকুরকে ভেঙে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে।

এইভাবে ঠাকুর দেবতা নিয়ে দুষ্টুমির খেলা খেলতে খেলতেই বড় হতে থাকে লোকনাথ। বাবা-মা ছেলের এই সব দুষ্টুমির কথা শুনে চিন্তিতও হন।

এগার বছর বয়সে উপনয়নের দিন ঠিক হয় লোকনাথের। রামকানাই সবাইকে জানান লোকনাথের উপনয়নের পরই তিনি গুরুর কাছে দীক্ষা দিয়ে সন্ন্যাসী হতে পাঠাবেন। গুরু ঠিক হলেন আর এক মস্ত পন্ডিত ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ভগবান গাঙ্গুলী। যদিও তাঁর বয়স হয়ে গেছে, তবুও লোকনাথকে দীক্ষা দিয়ে সন্ন্যাসব্রত পালন করানোর ভার তিনি হাসিমুখেই গ্রহণ করলেন।

লোকনাথের উপনয়নের দিন গ্রামের আরও কয়েকটি ছেলেরও উপনয়ন হলো। এর মধ্যে বেণীমাধবের সঙ্গেই বেশি বন্ধুত্ব ছিল লোকনাথের। লোকনাথ সন্ন্যাসী হবে শুনে বেণীমাধবও তার বাবা মাকে ধরে বসল, বাবা আমিও লোকনাথের সঙ্গে যাব। ছেলের কথা শুনে বাবা মা তো চমকে ওঠেন। শেষে অনেক বুঝিয়েও যখন কিছু হয় না তখন ভগবান গাঙ্গুলীই বলেন, ঠিক আছে বেণীমাধবও আমাদের সঙ্গে যাবে।

লোকনাথেরও খুব আনন্দ হয়। বেণীমাধব সঙ্গে থাকলে খুব মজাই হবে। সব অনুষ্ঠান শেষ হলে একদিন শুভ সময় দেখে ভগবান গাঙ্গুলী তাঁর দুই শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন। অনেক ভেবে কিছুদিন কালীঘাটেই সাধনা করানোর কথা স্থির করলেন ভগবান। কালীঘাটের মা কালীর জায়গায় সন্ন্যাসীদের ভিক্ষাও দেয় অনেক মানুষ। তখন তো এখনকার মতো যাতায়াতের সুবিধে ছিল না। হাঁটাপথেই কালীঘাটে পৌঁছুলেন সবাই। কালীঘাটের চারদিকে তখন ঘন জঙ্গলে ভরা। একপাশে গঙ্গা, মাঝখানে মায়ের মন্দির। জঙ্গলের মধ্যেই একটু পরিষ্কার জায়গা দেখে ভগবান গাঙ্গুলী লোকনাথ আর বেণীমাধবকে নিয়ে ডেরা বাঁধলেন। লোকনাথের কিন্তু খুব মজা হচ্ছিল এইভাবে থাকতে। মনের মধ্যে অজানাকে জানবার একটা আকাঙ্ক্ষা তো ছিলই, তার উপর ঘন জঙ্গলে ঘেরা কালীঘাটে এসে মনটাই যেন অন্যরকম হয়ে গেল। কিছুটা দূরেই কয়েকজন জটাজুটধারী সাধুও থাকেন।

একদিন বেণীমাধবকে ডেকে চুপিচুপিই লোকনাথ বলে, এই বেণী আয় একটা মজা করি। লোকনাথের মজার খেলা তো বেণীমাধব জানে। তাই বলে, না এখানে কিছু করতে যেও না। গুরুদেব রাগ করবেন।

আরে তুই আয় না আমার সঙ্গে। কথাটা বলেই বেণীমাধবের হাত ধরে টানতে থাকে লোকনাথ। অগত্যা সঙ্গে যেতেই হয়। সন্ধ্যাও গড়িয়ে এসেছে। আস্তে

আস্তে সাধুবাবাদের ডেরার সামনে এসে দাঁড়ায় লোকনাথ। সামনে আগুন জ্বালিয়ে সাধুবাবারা ধ্যান করছেন। মুখে দুষ্টুমির হাসি নিয়ে একবার বেণীমাধবের দিকে তাকায় লোকনাথ, তারপর ধীরপায়ে সাধুদের কাছে যায়। একটু সময় কি যেন চিন্তা করে লোকনাথ। কিন্তু তারপরই সাধুদের জটা ধরে টানতে থাকে। বেণীমাধবকেও ইশারায় কাছে ডাকে। চোখ বন্ধ করেই তো বসে আছেন সাধুরা। লোকনাথের ডাক উপেক্ষা করতে পারে না বেণীমাধব, দুষ্টুমিতে বরাররই সে লোকনাথের সংগী। কাছে যেতেই লোকনাথ চুপি চুপি বলে, জটা ধরে টান, দেখবি কেমন মজা হবে।

শুধু একদিনই নয়– এইরকম প্রায়ই দুই বন্ধু গিয়ে ধ্যানমগ্ন সাধুদের বিরক্ত করতে লাগল। প্রথম প্রথম সব বুঝলেও ছোট ছেলেদের এই দুষ্টুমিতে কিছু বলতেন না সাধুরা। কিন্তু পরে আর সহ্য করতে না পেরে ছেলে দুটির সন্ধান নিয়ে সাধুবাবারা ভগবান গাংগুলীর কাছে গিয়ে নালিশ জানালেন। সব শুনে গুরুদেব প্রথমে তো খুব বকলেন আর বিশেষ করে লোকনাথকে ডেকে বললেন, ছিঃ বাবা, সাধুদের নিয়ে এইরকম ঠাট্টা তামাসা করতে নেই। বড় হয়ে তোমাদেরও যখন এইরকম জটা হবে তখন কেউ যদি সে জটা ধরে টানে তখন কেমন লাগবে।

গুরুদেবের কথায় সব বুঝতে পারলেন লোকনাথ। এরপর মজার খেলা বন্ধ হলো। ভগবান গাংগুলীও দুই শিষ্যকে নিয়ে সন্ন্যাসীর কঠোর তপস্যা আর ব্রত পালন শিক্ষা দেবার জন্য এবার হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলের দিকে যাত্রা করলেন।

ঘোষাল পরিবারের এই দুষ্টু ছেলে লোকনাথই পরবর্তীকালে 'ত্রিকালজ্ঞ ঋষি বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী' নামে অভিহিত হন। সুদীর্ঘ ষাট বছর বিভিন্ন তীর্থস্থান ও হিমালয়ের গহন অরণ্য অঞ্চলে তপস্যা করে শেষে গুরুর নির্দেশেই মানুষের মংগলের জন্য লোকহিতকারী লোকনাথ নিচে মানুষের মধ্যে নেমে এসেছিলেন। বহুকাল বরফের মধ্যে থাকার ফলে তাঁর শরীরের চামড়া পুরু হয়ে গিয়েছিল–গায়ের রং হয়েছিল বরফের মত সাদা। মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিশাল জটা। চোখের পাতাও পড়ত না।

মানুষের সমাজে এসে অনেক চমকপ্রদ অলৌকিক ঘটনারও প্রকাশ ঘটিয়েছেন লোকনাথ। একবার তো বারাদীতে গ্রামের জমিদারের ছেলে তাঁর আশ্রমে ঢুকে একজন সাধুকে খুব মারধোর করল। গ্রামের লোকজন এবং ব্রহ্মচারীবাবার অনুগত ভক্তরা আদালতে সেই জমিদারের ছেলের নামে মামলা করল। ব্রহ্মচারী বাবাকে সাক্ষী দিতে হাজির হতে হলো আদালতে।

নারায়ণগঞ্জ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছারি। লোকে লোকারণ্য আদালতকক্ষ। তিলধারণের জায়গা নেই। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। আসামীর কাঠগড়ায় যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে সবাই চেনে। বারাদীর বিখ্যাত জমিদার বাড়ির ছেলে–ফৌজদারী মামলার আসামী হয়েছে। উপস্থিত দর্শকদের সবার মনেই এক দারুণ উৎকণ্ঠা।

হঠাৎ আদালত কক্ষের সামনের দরজার দিকে একটা গোলমালের শব্দ হতেই সবার দৃষ্টি সেদিকে ঘুরে যায়। সাক্ষী দিতে আসছেন এক জটাজূটধারী সন্ন্যাসী।

ধীরে শান্ত পায়ে সন্ন্যাসী ঠাকুর সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন।

শুরু হলো প্রশ্নের পালা। মোক্তারও প্রস্তুত। এমন অদ্ভুত এক সন্ন্যাসীকে দেখে ম্যাজিস্ট্রেটও অবাক হয়ে গেছেন। মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ এঁকে তবু তিনিই প্রথম প্রশ্ন করেন, আপনার বয়স কত?

সাধুবাবা হেসে জবাব দেন, বয়সের কথা তো ভাবিনি কখনও তবে, ১৫০ কি ১৫৫ বছর নিশ্চয়ই হবে।

সাধুর উত্তর শুনে শুধু ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটই নয়, আদালত কক্ষের অনেকেই চমকে ওঠে। বলে কি লোকটা। একশ বছরের লোকই যেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না সেখানে উনি বলছেন ওঁর বয়স দেড়শ পেরিয়ে গেছে। রুমালে চশমার কাচ মুছে এবার মোক্তারবাবু এগিয়ে আসেন। সাধুবাবার সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর সুরে বলেন, ঠিকমত সত্যি কথা বলুন। আপনার এই রকম অসম্ভব কথা মহামান্য আদালত মানতে রাজী নয়।

মোক্তারবাবুর জোর গলার কথা শুনে দর্শকদের মুখ থমথম করতে থাকে। দর্শকদের মধ্যে অনেকেই এই ব্রহ্মচারী সাধুবাবাকে জানত। তারাও অবাক বিস্ময়ে সাধুবাবার মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকে। মোক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হেসে সাধুবাবা বলেন, আমার বুদ্ধিমত আমি তো সত্যি কথাই বলছি। তবে বয়সের কথায় তোমাদের যদি আপত্তি থাকে তাহলে এই আদালতের পক্ষে যা সংগত হবে আমার বয়স তাই লিখে নাও।

সাধুবাবার জবাব শুনে কেউ আর কথা বলতে পারে

ফিরে ফিরে দেখে লোকে...
সুপার রিন-এর চমকটিকে !
सुपर
रिन
सफ़ेदी की चमकार
सुपार रिन-এর শুভ্রতার অধিক চমক...
অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন
LINTAS RIN 90 2418BG

না। এদিকে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তখন মোক্তারবাবুকে ইঙ্গিত করলেন। তিনি কেরানীবাবুর কাছে সাধুবাবার বয়স ৭০/৭৫ বছর লিখে নিশ্চিন্ত হলেন। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাধুবাবা আগের মতই মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

এবার আসামী পক্ষের মোক্তার উঠে দাঁড়ান। এমনভাবে মামলা পরিচালনা করতে হবে যাতে তাঁর মক্কেল সেই জমিদারপুত্র সসম্মানে মুক্তি পান। কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব? এই সাধুবাবাকে সবাই মান্যও করে। আবার এঁর কথার উপরই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের রায় নির্ভর করবে। কারণ প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সাধুবাবাই এ মামলার প্রধান সাক্ষী।

যাই হোক সাধুবাবা যে বয়সের দিক থেকে অতিবৃদ্ধ ও তাঁর দৃষ্টিশক্তি এবং মনে রাখার ক্ষমতাও খুব বেশি নেই এই দিকটার কথা মনে করেই আসামী পক্ষের মোক্তারবাবু সাক্ষীর দিকে এগিয়ে যান। আগের মতই সাধুবাবা স্মিত হাসিতে তাকান। মোক্তারবাবু প্রশ্ন করেন, আপনি মহামান্য আদালতের সামনে নিজের মুখেই বললেন আপনার বয়স দেড়শ বছরেরও বেশি, তাহলে আশ্রমে যে ঘটনাটি ঘটেছিল আপনার এই বয়সের দৃষ্টিশক্তি দিয়ে তা কি আপনি দেখতে পেয়েছিলেন? আমার তো মনে হয় আপনি কিছুই দেখেন নি। ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুরের সামনে এবার আপনি সত্যি কথা বলুন যে আসামী সম্পূর্ণ নির্দোষ।

মোক্তারবাবুর কথা শেষ হতেই আদালতকক্ষে গুঞ্জন শুরু হলো। ব্রহ্মচারী সাধুবাবা নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নির্দেশে দর্শকদের গুঞ্জন কম হলে সাধুবাবা মোক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আমার আরও কাছে এসো। মোক্তারবাবু একটু ভয়ে ভয়েই এগিয়ে গেলেন। সাধুবাবা তাঁর লম্বা হাত সামনে মেলে ধরে দরজার দিকে দেখিয়ে বললেন, ওই যে দূরে একটা গাছ দেখা যাচ্ছে–তুমি দেখতে পাচ্ছ তো! ঐ গাছ বেয়ে কোনো কিছু উপরে উঠছে সেটা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ?

সাধুবাবার কথায় উপস্থিত দর্শক ম্যাজিস্ট্রেট সবাই হতভম্ব হয়ে যায়। কারও মুখেই কথা জোগায় না। আদালত কক্ষের দরজা দিয়ে বহুদূরের একটা গাছ দেখা যাচ্ছে ঠিক, কিন্তু সেই গাছে কোনো প্রাণী উঠছে কিনা সেটা এখান থেকে দেখা কি করে সম্ভব? সাধুবাবার এই অসম্ভব কথা শুনে মোক্তারবাবুও গম্ভীর হয়ে জবাব দেন, অবাস্তব কথার জবাব হয় না। এত দূর থেকে গাছের কোনো জিনিস দেখা সম্ভব নয়।

ব্রহ্মচারী সাধুবাবা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দিকে মুখ করে এবার বললেন, আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একসারি লাল পিঁপড়ে মাটি থেকে ঐ গাছের গা বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে।

সমস্ত আদালতকক্ষ এবার উল্লাসে ফেটে পড়ার মতো হয়। ব্রহ্মচারী সাধুবাবার অনুগত ভক্তবৃন্দেরা জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে। কাছারিসুদ্ধু মানুষ অবাক হয়ে সাধুবাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কেরানীবাবু আর পেয়াদাকে সাধুবাবার কথার সত্যতা যাচাই করতে সেই গাছের কাছে যেতে নির্দেশ দেন। একসঙ্গে বহু মানুষ ছুটে যায় সেই গাছের দিকে। তারপর অবাক বিস্ময়ে তারা দেখে সত্যি একসারি লাল পিঁপড়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে দলবদ্ধভাবে গাছ বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে।

সাধুবাবার দৃষ্টিশক্তি নিয়ে যে সংশয় মোক্তারবাবু ও অন্য সবার মনে এসেছিল এই ঘটনা দেখে তা নিমেষে উধাও হয়ে যায়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও সব শুনে নতমস্তকে উঠে দাঁড়ান। হাসিমাখা মুখেই সবার দিকে তাকিয়ে থাকেন ব্রহ্মচারী সাধুবাবা।

রতুর কৃচ্ছ্রসাধন

প্রণব হোড়

দু'দু'বার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ডিগবাজি খাওয়ার পর তৃতীয়বার পরীক্ষা দিয়েই রতু জ্যোতিষী সাধু-সন্ন্যাসীর খুব ভক্ত হয়ে পড়েছিল, কারণ বাবা বলে দিয়েছেন, এবারেও ফেল করলে, সোজা পাঠিয়ে দেবেন বিহারে, রতুর মামার বাড়িতে। সেই ভয়েতে রতু আরো তটস্থ। শহরের বন্ধুবান্ধব ছেড়ে, নেপচুন ক্লাবের মেম্বারশিপ্ ছেড়ে, ইস্টবেংগল-মোহনবাগানের খেলা ছেড়ে কে যেতে চায় পচা ধ্যাদ্দেড়ে গোবিন্দপুরে! তাই যে করেই হোক এবারে পাশ করার জন্য আদা-জল খেয়ে লেগেছিল রতু।

পরীক্ষার একমাস আগে থাকতে রাত তিনটের সময় ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসে যেত বিছানার উপর। শেষের দিকে ভোররাত্রে ঘুম থেকে ওঠা এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল যে পরীক্ষা যেদিন শেষ হয়েছে, তার পরের দিনও ঘুমের ঘোরের মধ্যে রতু ভোররাত্রে বিছানা থেকে উঠে বইয়ের টেবিলে বই হাতড়ে বেড়িয়েছে।

অনেকক্ষণ পর খেয়াল হয়েছে–তাই তো, আজ তো আর পড়তে হবে না। পরীক্ষা তো গতকালই শেষ হয়েছে।

আবার গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়েছিল রতু।

এবারে রতু মোটামুটি ভেবে নিয়েছিল, পরীক্ষা ভালো হয়েছে, অতএব পাশ সে করে যাবে।

তাই বেশ নিশ্চিন্ত মনেই দিন কাটছিল রতুর।

কিন্তু হঠাৎ গোল বাধলো মাস দুয়েক পর। সেদিন রাতে কেন জানি না রতু স্বপ্ন দেখে বসলো, গত তিন বছরের ছেঁড়া ছেঁড়া বইগুলোর উপর থেকে ধুলো ঝেড়ে আবার রতু নতুন করে পড়তে বসেছে।

ব্যস্, পরদিন সকাল থেকেই ধরে গেল ভয়, সেই সংগে দুশ্চিন্তা। তবে কি এবারেও গোল্লা! স্বপ্ন যে সব সময় মিথ্যা হবে তা তো নয়। সত্যি হতে কতক্ষণ! হঠাৎ রতুর মনে পড়ে পাঁজিতে লেখা 'স্বপ্নতত্ত্বে'র কথা। কোন দিনের স্বপ্ন সফল কিংবা অসফল হয় তা লেখা থাকে ঐ 'স্বপ্নতত্ত্বে'।

রত্নর দিদি ভালো দেখতে পারে 'স্বপ্নতত্ত্ব'র ঐ সব খুঁটিনাটি ব্যাপার। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, দিদিকে স্বপ্নের কথা বলা যাবে না। ঠিক তাহলে সাত কান করবে ও সে-কথা। তার চাইতে বৌদিকে বলা ভালো, দিদির মতো সব কথা ফাঁস করে দেওয়ার অভ্যাস তার নেই।

অগত্যা বৌদির কাছে গিয়েই দাঁড়ালো রত্ন। সব শুনে একটু ভারিক্কী চালে বৌদি বলল, বেশ, পাঁজিটা নিয়ে আয়, বলে দিচ্ছি।

আবার ঝামেলা। পাঁজি থাকে ঠাকুরঘরে। সাত-সকালে সেখানে ঠাকুমা ঢুকে বসে আছেন, কখন বেরোবেন ঠিক নেই। কিন্তু রত্নর কপাল ভালো। ঠাকুরঘরে ঢুকে দেখে ঠাকুমা চোখ বন্ধ করে মালা জপছেন। বেশি কষ্ট হলো না। চুপিসাড়ে ঠাকুরের আসন থেকে পাঁজিটা নিয়ে মুহূর্তে উধাও হলো রত্ন বৌদির কাছে।

বৌদি বেশ কিছুক্ষণ পাঁজি ঘেঁটে বলে, স্বপ্ন কখন দেখেছিস? মাঝরাতে না শেষ রাতে?

শেষ রাতে–গলাটা কেঁপে যায় রত্নর।

হুঁ, আবার কিছুক্ষণ ভাবে বৌদি, কাল ছিল দ্বাদশী। হ্যাঁ, দ্বাদশীর স্বপ্ন সফল হবে।

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হলো। রত্নর মনে হলো পায়ের নিচে মাটি নেই। অসংখ্য লাল লাল বল মাথার চারধারে ঘুরপাক খাচ্ছে, উপর থেকে নিচে, নিচে থেকে উপরে, ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে। রত্ন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ট্রেনে চেপে ও বিহার যাচ্ছে, সঙ্গে ব্যাগ-ভর্তি সেই ছেঁড়া বইগুলো।

সেদিন থেকেই রত্ন কেমন যেন বদলে গেল। মুখে ভাত রোচে না, রাতেও ঘুম নেই। বিকেলে নেপচুন ক্লাবেও ক্যারাম খেলতে যায় না। এমনকি বন্ধুরা বাড়িতে এলেও তাদের সঙ্গে দেখা করে না রত্ন। ভাবে, এদের তো ছেড়ে যেতেই হবে বিহারে, তবে আর মায়া বাড়িয়ে লাভ কী!

এদিকে রত্নর কান্ড দেখে মা এবং ঠাকুমা দু জনই ভেবে ভেবে অস্থির। ভয় পেয়ে রত্নর ঠাকুমা তো সেদিন রত্নর বাবাকে বলেই বসলেন, খোকা, রত্নটাকে একবার ডাক্তার দেখা দিকি। দিন দিন ছেলেটার যে কি ভাব গতি হচ্ছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। না খেয়ে খেয়ে চেহারাও একটা সুতোয় গিয়ে ঠেকেছে।

রত্ন আড়ি পেতে সেই সময় শুনছিল ঠাকুমার কথা-গুলো। মনে খুব আশা জেগেছিল, এবার হয়তো বাবা একটু নরম হলেও হতে পারেন। কিন্তু কোথায় কি?

রত্ন দিব্যি শুনলো খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বাবা ঠাকুমাকে বলছেন, বেশ তো মা, সুতোয় তাহলে আর গিঁট বাঁধতে কষ্ট হবে না।

কান্না পেয়ে গিয়েছিল রত্নর। দৌড়ে সে পালিয়ে এসেছিল দরজার আড়াল থেকে। ভেবেছিল, আর নয়, এবার সে বাড়ি ছেড়ে পালাবে। বোম্বে-দিল্লী-মদ্রাজ যেখানেই হোক।

হয়তো সত্যি শেষ পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে পালাতো রত্ন, যদি না খবরের কাগজে সেদিন সকালে ছোট্ট বিজ্ঞাপনটা হঠাৎ চোখে পড়তো। একজন সাধুবাবার ছবি দিয়ে পাশে বড় বড় করে লেখা ছিল–

"যদি কেহ কোনো সমস্যার সম্মুখীন হইয়া থাকেন, তবে অবিলম্বে হিমালয় হইতে সদ্য আগত এই সাধুবাবাজীর পরামর্শ নিন। ইনি আপনাকে বাঁচাইবেন। ফী–২৫ টাকা মাত্র। সাক্ষাৎ সময়–দিবা ২টা হইতে রাত্রি ৮টা। ঠিকানা...."

বিজ্ঞাপনটা দেখে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে রত্ন। ভাবে–আর নয়, এবার এখানেই যাবে ও। দেখাই যাক না। এসব সাধু-সন্ন্যাসীরা তো অনেক কিছুই করতে পারে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে টাকা। পঁচিশ টাকা রত্নকে কে দেবে এখন! অবশ্য বৌদিকে একবার বলে দেখা যেতে পারে।

শেষকালে বৌদির কাছে অনেক বলে কয়ে ত্রিশটা টাকা ম্যানেজ করে রত্ন। তারপর আর এক মিনিটও দেরি করে না।

ঐদিনই চললো রত্ন সাধুবাবাজীর দর্শনে।

সাধুবাবাজীর ঘরে ঢুকে প্রথম দর্শনেই চমকে উঠেছিল রত্ন–উরি বাব্বা! কি ভীষণ চেহারা, জবা ফুলের মতো লাল দুটো চোখ। গায়ে টকটকে লাল কাপড়, ভুঁড়িখানা ইয়া বিশাল। মাথায় জটা। রত্নকে দেখে অন্তর্যামীর মতো বলে উঠলেন, কিরে ব্যাটা, এত ফেল করছিস কেন?

ব্যস্, ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেললো রত্ন। সাধুবাবাজী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন রত্নর কান্না দেখে। অত বড় ছেলে যে ঐ ভাবে কেঁদে ফেলবে তা বোধহয় তিনিও বুঝতে পারেন নি প্রথমে। রত্নর পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, ঠিক আছে, আর কাঁদিস না। শোন, তোর হাতটা দেখি।

কান্না থামিয়ে দুই হাতের চেটো টান টান করে মেলে ধরে রত্ন বাবাজীর চোখের সামনে। অনেকক্ষণ হাত দেখে বাবাজী বলেন, শোন, তোর এ বছরও পাশ করার আশা নেই। তবে হ্যাঁ, করতে পারিস পাশ যদি এক মাস

কৃচ্ছ্রসাধন করতে পারিস। কিরে, পারবি ?

হ্যাঁ, বাবা, নিশ্চয় পারবো। কিন্তু কি করতে হবে ? একটু যেন আশার আলো দেখে রতু।

শোন বলছি, বাবাজী বলতে শুরু করেন, কাল বাদে পরশু অমাবস্যা। তুই সেদিন কাকভোরে গঙ্গাস্নান করে আসবি। তারপর একমাস নিরামিষ আহার করবি, মাদুরে শুবি, সিনেমা-থিয়েটার একদম নয়। আমি তোকে একটা লোহার আংটি দিচ্ছি, গঙ্গাস্নান করে এটা ধারণ করবি। মনে থাকবে ?

আনন্দে গদগদ রতু বলে ওঠে, হ্যাঁ বাবাজী, খুব মনে থাকবে।

কিন্তু খবর্দার, বাবাজী আবার হুঁশিয়ার করেন, ঠিক একমাস কিন্তু নিরামিষ খাওয়া চাই। একদিনও এদিক সেদিক হলে চলবে না। তাহলেই আংটির সব গুণ কেটে যাবে। তার পরিণাম বুঝতেই তো পারছিস!

বাবাজীর পায়ে হুমড়ি খেয়ে প্রণাম করে, পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দিয়ে একটা আধা মরচে পড়া লোহার আংটি নিয়ে বাড়ি ফেরে রতু বেশ রাত করে।

অমাবস্যার দিন থেকে সাধুবাবার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা শুরু করলো রতু। আগে থাকতেই ও বাড়িময় রটিয়ে দিয়েছিল তার আগামী একমাসের কৃচ্ছ্রসাধন ব্রতের কথা। সে-কথা শুনে রতুর মা এবং ঠাকুমা দুজনেই মহাখুশি।

ভাবলেন, যাক ছেলেটার তাহলে ধর্মের দিকেও মন আছে।

রতুর জন্য স্পেশাল নিরামিষ রান্নার ব্যবস্থা হলো। সে এক এলাহী ব্যাপার!

ছোট দাদাবাবু, বিশ্বাস করো আমি কিছু জানি না।

রত্নর জন্য সকালে ব্রেকফাস্ট হলো দুধ এবং ফল। দুপুরে বাসমতী চালের ভাত, মাখন, সুক্তো, দু রকম তরকারি, শেষ পাতে দই। রাত্রেও সেই এক ব্যাপার, শুধু ভাতের বদলে খান আষ্টেক ঘি মাখানো রুটি।

কয়েকদিনের মধ্যে রত্নর বন্ধুদের কানে গিয়েও পৌঁছাল এ খবর। ব্যঙ্গ করে কয়েকজন টিপ্পনীও কাটলো।

কিন্তু রত্ন স্থির-অবিচল।

বন্ধুরা দল বেঁধে ফুটবল ম্যাচ দেখতে যায়, সিনেমা দেখতে যায়-রত্ন ঘরে থাকে। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে হিসাব করে-কতদিনে ওর কৃচ্ছ্রসাধন ব্রত শেষ হবে?

কখনো কখনো রান্নাঘরে মাংস রান্নার গন্ধ কিংবা ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ পেলে রত্নর জিব সুড়ুৎ করে ওঠে। আবার শক্ত করে নেয় মন।

এর মধ্যে আবার পিসীমার মেয়ের বিয়ে লাগলো। বাড়ির সবাই গেল বিয়েতে। রত্ন শুধু ঘরে বসে ছাদের কড়িকাঠই গুনলো।

দেখতে দেখতে একমাস কেটে গেল। অমাবস্যা ঘুরে এলো আবার। রত্নর ব্রতের শেষ দিন এলো অবশেষে।

সকাল থেকে আনন্দ ধরে না রত্নর। এদিকে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হওয়ার সময়ও হয়ে গিয়েছে, যে কোনোদিন বেরোতে পারে রেজাল্ট। কিন্তু রত্নর আর ভয়ের কারণ নেই। এই কয়দিন সে রোজ নিরামিষ খেয়েছে, আঙুল থেকে সেই লোহার আংটিটা আধ সেকেন্ডের জন্যও খোলে নি। এবার তাকে আটকাবে কে? এখন শুধু আজকের দিনটা কোনো রকমে কাটাতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

কিন্তু বিপত্তিটা ঘটলো সেদিন দুপুরে।

প্রতিদিনের মতো সেদিন দুপুরেও বৌদি এসে দিয়ে গিয়েছিল রত্নর স্পেশাল নিরামিষ রান্না। আর তার মধ্যেই রত্ন আবিষ্কার করে বসে চিংড়িমাছ।

সুক্তোর ভেতর ছিল সেই চিংড়িমাছটা।

রত্ন তো অবাক।

হায়-হায়, শেষদিন এ কি কান্ড!

রাগে রত্ন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে, চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তোলে। দিদি, বৌদি থেকে শুরু করে মা, ঠাকুমা পড়ি-মরি করে ছুটে আসেন সেই চিৎকার শুনে। চিংড়িমাছের কথা শুনে সকলেই হতবাক। বৌদি সুক্তোর বাটিটার দিকে তাকিয়ে বলে, আজ তো বাড়িতে মাছই আসে নি, তাহলে চিংড়িমাছটা এলো কোথা থেকে। দেখি তো কোথায় তোর চিংড়িমাছ?

বৌদি সুক্তোর ভেতর থেকে যে জিনিসটা টেনে বের করে, দেখা গেল সেটা চিংড়িমাছই নয়। একটা আরশোলা।

ঘেন্নায় রত্নর গা গুলিয়ে ওঠে। 'ওয়াক্'-করে ওঠে সে। যত রাগ গিয়ে পড়ে রান্নার ঠাকুরের উপর। ঐ ব্যাটার গাফিলতিতেই সে আমিষের ছোঁয়া খেয়ে ফেলল, তাও আবার আরশুলা নামক কদাকার কুৎসিত জীবের আমিষ। থুঃ-থুঃ।

এবার আর রক্ষে নেই। রত্নর পরীক্ষায় ফেল

ছবি, ছড়া আর গল্পে ভরা ছোটদের মনের মত বই

- চোদ্দ পিদিম : গৌরী ধর্মপাল ৬.০০
- তিনটে তামার পয়সা : মীরা বালসুব্রমনিয়ম ৭.০০
- টুনটুনির গল্প : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৩.০০
- জানোয়ার : লীলা মজুমদার ৪.০০
- কুমীর সাহেব : প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩.০০
- শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে : শশিভূষণ দাশগুপ্ত ৫.০০
- ছড়ার দেশে টুলটুলি : শৈল চক্রবর্তী ৬.০০
- মজার কবিতা : উপেন্দ্র মল্লিক ৫.০০
- মজার ছড়া : ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ৫.০০
- রুবিক ঘনকের সহজ সমাধান : ছবিনাথ মন্ডল ৬.০০
- খাগড়াই : সুকুমার রায় ৩.৫০

এবং যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অমর রচনার কয়েকটি:

- আষাঢ়ে স্বপ্ন ৩.০০
- হাসিখুসি-১ ৩.৫০
- হাসিখুসি-২ ৩.৫০
- হাসিরাশি ৪.৫০

- বঙ্কিম উপন্যাসসমগ্র [কিশোর সংস্করণ]
  ডঃ বিজন বিহারী ভট্টাচার্য ২৫.০০
- জন্মদিনে উপহারে
  আমার শৈশব ২৫.০০

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড

৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলকাতা-৯

: ফোন-৩৫-৭৬৬৯ :

অবশ্যম্ভাবী। আংটির গুণ সব কেটে গেছে।

হঠাৎ ভীষণ কান্না পায় রত্নর।

অতিকষ্টে আটকায় সেই কান্না।

না, আর নয়। ফেলই যখন করতে হবে তখন ঠাকুরকে আজ এক হাত দেখে নেবে রত্ন। ঐ আরশোলার সুক্তোই খাওয়াবে ঠাকুরকে দিয়ে!

কিন্তু গেল কোথায় লোকটা!

আগে থাকতেই সব আঁচ করতে পেরে গা-ঢাকা দিয়েছে সে। ভাতের হাঁড়ি থেকে একটা এঁটো খোন্তা নিয়ে রত্ন ঠাকুরকে খুঁজতে শুরু করে সমস্ত বাড়ি তন্ন-তন্ন করে।

মা, ঠাকুমা কারও কথা শোনে না রত্ন। আজ এস্পার কি ওস্পার।

শেষকালে ঠাকুরের দেখা মিললো ঠাকুমার খাটের নিচে।

রত্নকে দেখে ভয়ে সে হাউ হাউ করে ওঠে, ছোট দাদাবাবু, বিশ্বাস করো আমি কিছু জানি না।

গর্জে ওঠে রত্ন, জানতেও হবে না। শুধু আমার সামনে রান্না করা আরশোলাটা তুমি খাবে। চলো আমার সঙ্গে।

ঠাকুরের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে রত্ন নিজের ঘরে। হঠাৎ সশব্দে টেলিফোনটা বেজে ওঠে। রত্নর মা গিয়ে ফোন ধরেন, হ্যালো, কে? ও বড় খোকা– কী ব্যাপার? অ্যাঁ, রত্নর রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে?

রত্নর ডান হাত থেকে ঠং করে খোন্তাটা পড়ে যায়। হৃৎপিন্ড ধুক্ ধুক্ করে ওঠে।

তবে কি এবারও...! ঐ আবার শোনা যাচ্ছে মায়ের গলা, হ্যালো–হ্যালো। হ্যাঁ, কী বলছিস? রত্ন পাশ করেছে। কোন ডিভিশন? কী? কী বললি? ফার্স্ট ডিভিশন!

ছবি: আত্রেয় শর্মা

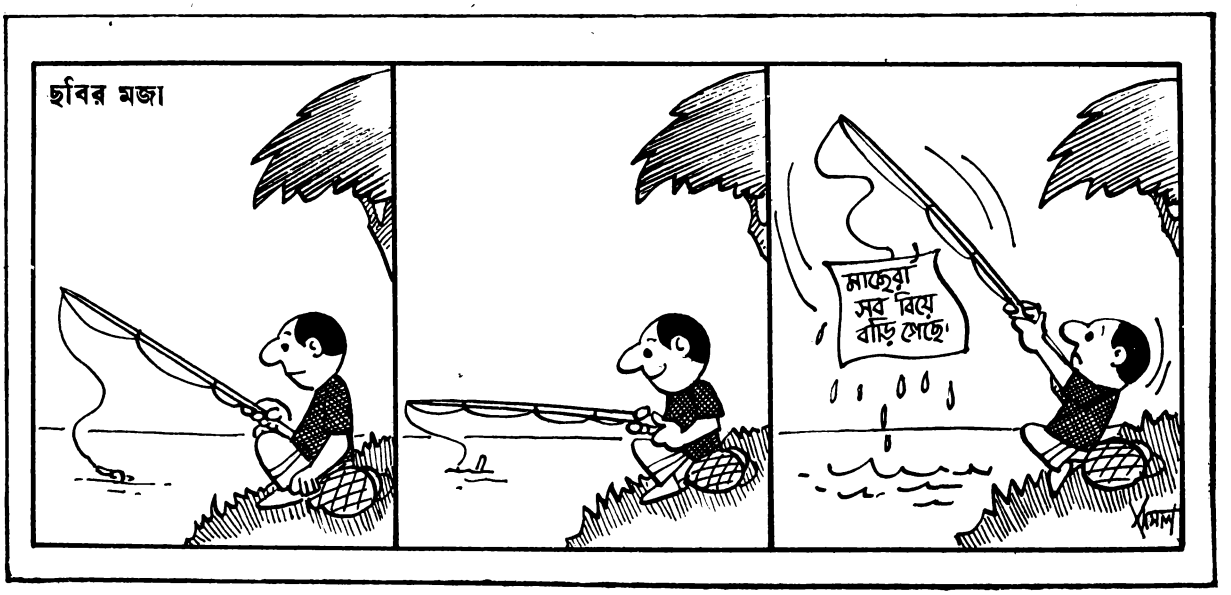

ধূমকেতু আসছে

আরতি বসু

পালিৎসের বাড়ি জার্মানির একটি ছোট্ট গ্রামে। পালিৎস একটু খেয়ালী ধরনের মানুষ। সারাদিন খেত-খামারে দিব্যি কাজকর্ম করে, গরু-ভেড়ার দেখাশোনা করে। কিন্তু রাত্তিরে তার টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে বসা চাই-ই চাই। এক একদিন এমনও হয় যে খাওয়া দাওয়ার কথাও মনে থাকে না। বাড়ির লোকেরা অপেক্ষা করে করে হয়রান হয়ে শেষ পর্যন্ত খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ে। পালিৎস তন্ময় হয়ে চেয়েই থাকে রাতের আকাশের দিকে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা পালিৎসের দুই বন্ধু এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে। পালিৎসের তখন সময় কোথায়! আগের দিন যে নতুন তারাটা চোখে পড়েছে তার চেহারাটা একটু যেন অন্যরকম! পালিৎস তাই ভীষণ ব্যস্ত সেই নতুন তারাকে খুঁজে বার করতে। বন্ধুরা আর কী করে! ফিরেই যেতে হলো তাদের। যাবার সময় এক বন্ধু বলল, চাষাভুসো না হয়ে তোমার বৈজ্ঞানিক হওয়া উচিত ছিল। অন্য বন্ধু বলল, না হে না, ওর ওপর বোধহয় গ্যালিলিওর মতো বৈজ্ঞানিকরা ভর করেছেন। দেখো, একদিন ও চমকে দেবে সবাইকে। বন্ধুদের কথা শুনে সাদামাটা টেলিস্কোপটা থেকে একবারের জন্য মুখ তুলে পালিৎস বলেছিল, কী যে বল তোমরা! এ আমার নেহাতই শখ। খেয়াল ছাড়া আর কিছু না, ভালো লাগে তাই তারা দেখি।

কিন্তু সত্যি সত্যিই একদিন পালিৎস চমকে দিয়েছিলো পৃথিবীর তাবড় তাবড় বৈজ্ঞানিকদের।

১৭৫৮ সাল। সে বছর বৈজ্ঞানিকরা বিশেষত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বোধহয় একটি রাতও ঘুমিয়ে কাটান নি। সূর্য পাটে বসার সঙ্গে সঙ্গে সেই যে তাঁরা টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে বসতেন, উঠতেন একেবারে ফর্সা হবার পর। অধীর আগ্রহে তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন একটি ধূমকেতুর জন্য, বৈজ্ঞানিক এডমন্ড হ্যালি যার আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করে গেছেন। হ্যালি সাহেব জোর দিয়ে বলে গেছেন ১৭৫৮-র শেষ থেকে ১৭৫৯-এর প্রথমার্ধের মধ্যেই ফিরে আসবে এই ধূমকেতু। হ্যালি মারা গেছেন ১৭৪২ সালে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা ভোলেন নি তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণার কথা। ১৭৫৮র শুরু থেকেই তাই উত্তেজনার হাওয়া বইতে থাকে। এক একটি করে দিন, সপ্তাহ, মাস গড়ায় আর হ্যালি বিরোধী বৈজ্ঞানিকদের সন্দেহ জোরালো হয়। অবশেষে হঠাৎ একদিন এসে গেল সেই খবর হ্যালির ধূমকেতুকে দেখা গেছে এবং তাকে প্রথম দেখেছে সেই জার্মান চাষী পালিৎস। সে হারিয়ে দিয়েছে সবাইকে। বৈজ্ঞানিকরা

হ্যালির ধূমকেতুকে দেখতে পেলেন আরও এক মাস পরে।

হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে সেদিন অত যে হৈ চৈ হয়েছিল, তার কারণ ঐ ঘোষণাটি পুরোপুরি নির্ভর করেছিল স্যার আইজাক নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের (universal gravitation) উপর।

নিউটনের সঙ্গে হ্যালির প্রথম দেখা ১৬৮৪ সালে। নিউটন তখন মহাকর্ষ তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য তাঁর নতুন আবিষ্কৃত গাণিতিক পদ্ধতি ক্যালকুলাস নিয়ে খুব ব্যস্ত। হ্যালিকে দেখে নিউটন দারুণ খুশি। বললেন, তোমার মতো তরুণ উৎসাহী সঙ্গী পেলে আমি এখনও অনেক কিছু করতে পারি।

হ্যালি বললেন, কিন্তু আমার সমস্যাটা একটু অন্যরকম। আপনি আমার কাগজপত্রগুলো একটু দেখুন।

নিউটন দেখলেন সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। হ্যাঁ, ছেলেটা পরিশ্রমী বটে। দেখতে দেখতে নিউটনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন, ঠিক রাস্তাতেই তো এগোচ্ছ, অসুবিধেটা কোথায়?

হ্যালি বললেন, গ্রহের গতির বিষয়ে যে সমস্ত তথ্য আমরা পেয়েছি তার সঙ্গে মেলে এমন একটা প্রমাণ-যোগ্য কক্ষপথ তো নির্ণয় করতে হবে। কেমন হবে সে কক্ষপথ (orbit)?

–কেন, উপবৃত্ত (ellipse) — সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন নিউটন।

স্যার আইজাক নিউটন

এরপর নিউটন হ্যালিকে বোঝালেন তাঁর নব-আবিষ্কৃত তত্ত্ব–মহাকর্ষ।

সেই শুরু। তারপর তাঁদের বহুবার দেখা হয়েছে, যৌথ প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছে নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া'। 'প্রিন্সিপিয়া' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের জগতে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক সন্দেহের সুরে বলেছিলেন, অবিশ্বাস করছি না, তবু বাস্তব আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই।

এরপর কেটে গেছে আরও ৩০টা বছর। নিউটন মারা গেছেন, হ্যালি বসেছেন অক্সফোর্ড-ইউনির্ভাসিটির জ্যামিতি বিভাগের উচ্চতম আসনে। নিউটনের সঙ্গে যখন তিনি কাজ করেছিলেন, তখনই তাঁরা আন্দাজ করেছিলেন, গ্রহ-উপগ্রহের মতো ধূমকেতুদেরও নির্দিষ্ট কক্ষপথ আছে, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তারাও ফিরে ফিরে আসে। এই বিষয়টি নিয়েই হ্যালি গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। পৃথিবীর আকাশে যতবার ধূমকেতু দেখা গেছে তার সব ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়েছে। হ্যালি দেখলেন ১৩৩৭ থেকে ১৬৯৮-এর মধ্যে পৃথিবীর আকাশে মোট চব্বিশবার ধূমকেতু দেখা গেছে। এবার এদের কক্ষপথ-গুলো খুঁজে বার করতে হবে। আস্তে আস্তে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে–১৫৩১, ১৬০৭ ও ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে যে ধূমকেতুগুলো দেখা দিয়েছিল তাদের গতিপ্রকৃতি যেন অনেকটা একরকম। তবে কি তারা অভিন্ন? যদি তাদের অভিন্ন ধরে নেওয়া হয় তবে প্রশ্ন ওঠে যে ধূমকেতুটা ৭৬ বছর পর ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে এসেছিল, সে কেন ৭৫ বছর পর এল ১৬৮২ সালে? কী সেই শক্তি যা তার কক্ষপথ পরিক্রমার সময়কে কমিয়ে দিয়েছে! উত্তর একটাই–মহাকর্ষ। অনেক জটিল হিসাব নিকাশ এবং পর্যবেক্ষণের পর হ্যালি সিদ্ধান্ত করলেন, এই বিশেষ ধূমকেতুটি আবার ফিরে আসবেই ১৭৫৮-১৭৫৯ এর মধ্যে।

ফলেও গিয়েছিল তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী। সেই সঙ্গে প্রমাণিত হয়েছিল মহাকর্ষ তত্ত্ব। বিজ্ঞান সেদিন এক নতুন পথের দিকে বাঁক নিয়েছিল।

সেই বহু বিতর্কিত হ্যালির ধূমকেতু আবার আসছে। উত্তর গোলার্ধে খালি চোখে তাকে দেখতে পাওয়া যাবে ১৯৮৬ সালের জানুয়ারিতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ১৯৮৬র মার্চ মাস নাগাদ। টেলিস্কোপের লেন্সে অবশ্য মাস তিনেক আগেই সে ধরা পড়বে অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে '৮৫র নভেম্বরে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ৮৬র জানুয়ারিতে।

উপবৃত্তাকার কক্ষপথ ধরে এগিয়ে আসছে হ্যালির

ধূমকেতু। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সে ছিল সূর্য থেকে পাঁচশ পঁচিশ (৫২৫০০০০০০০) কোটি কিলোমিটার (5.25 thousand million) দূরে। সূর্য থেকে এটাই তার কক্ষপথের দূরতম বিন্দু। সেখান থেকে যখন সে ফিরতে শুরু করে তখন তার গতিবেগ ছিল দিনে প্রায় আশি হাজার (৮০,০০০) কিলোমিটার। তারপর থেকে ক্রমশই তার গতিবেগ বেড়ে চলেছে। খালি চোখে আমরা যখন তাকে দেখব তখন তার গতিবেগ দাঁড়াবে দিনে চল্লিশ লক্ষ (৪০,০০,০০০) কিলোমিটার।

পৃথিবী জুড়ে শুরু হয়ে গেছে তোড়জোড়। আমেরিকা পাঁচটি মহাকাশযান পাঠাচ্ছে এই ধূমকেতুর ছবি তোলার জন্য। জাপান ও রাশিয়া পাঠাচ্ছে দুটি করে এবং ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি (ESA) পাঠাচ্ছে একটি মহাকাশযান। আমাদের দেশ থেকে কোনো মহাকাশযান পাঠানো না হলেও জ্যোতির্বিদরা তৈরি হচ্ছেন শক্তিশালী ও উন্নত ধরনের টেলিস্কোপ নিয়ে। এ কাজের জন্য তাঁরা কিছু বেলুনও ব্যবহার করবেন। মাটি থেকে ৩০।৪০ কিলোমিটার ওপরে রাখা হবে এই বেলুনগুলি। দিল্লীতে এই সময় একটি আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ সম্মিলন অনুষ্ঠিত হবার কথা আছে। প্রায় ২০০০ বৈজ্ঞানিক নাকি যোগ দেবেন এই সম্মিলনে।

ধূমকেতু ভারি মজার জিনিস–ঠিক যেন মহাশূন্যে চলমান এক বিশাল ঝাঁটা। ঝাঁটার মতো দেখালেও ধূমকেতুর আসল শরীরটা কিন্তু অনেক ছোট এবং সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের মতোই গোলাকার। পাথর, লোহা ইত্যাদি ধাতুর টুকরো আর অ্যামোনিয়া–কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস মিলে তৈরি করে ধূমকেতুর শরীর এবং এ সব কিছুই থাকে হিমশীতল কঠিন অবস্থায়। মহাশূন্যে প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে ঘুরতে সে যতই সূর্যের দিকে এগোতে থাকে ততই বাড়তে থাকে তার উত্তাপ। উত্তাপে গ্যাসীয় উপাদানগুলি প্রসারিত হয়ে সূর্য যেদিকে তার উল্টোদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে পড়া গ্যাসই ধূমকেতুর লেজ, যা নাকি ৬৫ থেকে ১৩০ মিলিয়ন কিলোমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে।

পৃথিবীর আকাশে বেশ কয়েকটি ধূমকেতু দেখতে পাওয়া যায়। তবু হ্যালির ধূমকেতুর জন্যই বৈজ্ঞানিকদের আগ্রহ বেশি। কারণ এখনও তার আদিম গঠন প্রকৃতি বজায় আছে। বিকিরণ বা বিবর্তনের জন্য কোনো মৌল পরিবর্তন আসে নি, উপরের বরফের স্তরটা গলে গেছে মাত্র। সুতরাং সেখান থেকে সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি এমন

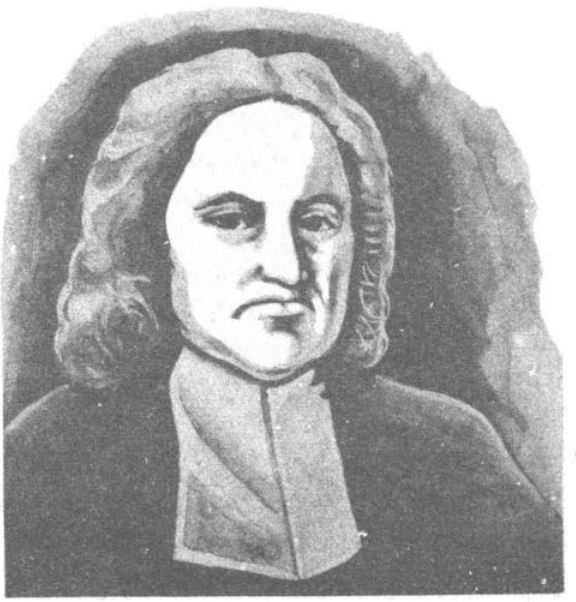

এডমন্ড হ্যালি

কি পৃথিবীতে কেমন করে প্রাণ সৃষ্টি হলো, সে সম্বন্ধেও মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

বৈজ্ঞানিকরা যতই মাতামাতি করুন, আকাশের বুকে বিদকুটে চেহারা নিয়ে ছুটে বেড়ানো ধূমকেতুর জন্য সাধারণ মানুষের মনে ভয়-ভাবনার অন্ত নেই। ধূমকেতু মানেই বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প, যুদ্ধ, মহাপ্রলয়–কী নয়!

ইউরোপের যুক্তিবাদী মানুষও বিশ্বাস করত ও কেউ কেউ এখনও করে, ধূমকেতু বিপর্যয়ের অগ্রদূত। তারা ইতিহাস থেকে নজির তুলে বলে, এই দেখো ধূমকেতু এসেছিল–খ্রীঃ পূঃ ২৪ শতকে প্রথম পিউনিক যুদ্ধের সময়, ৬৬ খ্রীঃ জেরুজালেম নগরী ধ্বংসের কিছু আগে, ১৪৫৬ খ্রীঃ তুর্কী এবং খ্রীষ্টানদের যুদ্ধের সময়, ১৬০৭ খ্রীঃ আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের বিপর্যয়ের সময়। আর কত চাই? এর পরেও অবিশ্বাস। ইদানিং কালের ভেতর ১৯১০ সালে যখন হ্যালির ধূমকেতু এসেছিল তখন হিসেব নিকেশ করে দেখা গেল ধূমকেতুর লেজের ঝাপটা লাগবে পৃথিবীতে। ভয়ে সকলের রক্ত হিম। গেলেই বুঝি পৃথিবী রসাতলে। কিন্তু কিছুই হলো না। ধূমকেতু এল, তার লেজ পৃথিবীর ওপর দিয়ে চলে গেল কেউ কিছু টেরই পেল না। দিব্যি সব কিছু ঠিকঠাক চলতে লাগল। তবুও মন মানে কই! ধূমকেতু আবার এগিয়ে আসছে একটু একটু করে, আর আমরাও চঞ্চল হয়ে উঠছি–কী জানি কী হয়!

ছবি ইন্দ্রনীল ঘোষ

বাজীকরের মৃত্যু

আলেকজান্দ্রু সাহিয়া

অনুবাদঃ পরাশর রায়

গ্রাম থেকে গ্রামে ধুলোর রাস্তায় ধুঁকতে ধুঁকতে ঘুরে বেড়ায় চাকা-টাল-খাওয়া ছইঅলা একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি।

ছাইরঙা ঘোড়াটা বেশ বড়সড়–পাঁজরের হাড় উঁচিয়ে আছে। চোখ দিয়ে সব সময় জল পড়ছে, গড়াচ্ছে ঘোড়াটার। ওটার গায়ে অজস্র তাপ্পি মারা সাজ। চলছে ঢিমেতালে–উদাসীন।

গাড়িটা মিহেল ঘের্লাসের। ঘের্লাস বাজীকর। চাষীদের আনন্দ আর উত্তেজনার খোরাক সে।

গ্রামের সরু পথে যখনই তার গাড়িটা দেখা যায় তখনই খবরটা বাজের আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে–বাজীকর ঘের্লাস এসেছে! চারদিক থেকে কাচ্চাবাচ্চার দল হাঁপাতে হাঁপাতে ওর কাছে ছুটে আসে, চিৎকার করে গাড়িটাকে উৎসাহ দিতে থাকে যতক্ষণ না গ্রামের মাঝখানে কোনো সরাইখানার সামনে এসে দাঁড়ায়।

ছইয়ের মধ্যে থেকে মিহেল ঘের্লাস বেরিয়ে আসে। ওর চওড়া কাঁধটা একটু ঝুঁকোনো, মুখ বুড়োটে আর বলি রেখাময়। লজ্জিতভাবে সে তার ফেল্ট টুপিটা মাথা থেকে খুলে ফেলে। মাথা নিচু করে অভিবাদন জানায়।

আনন্দে অধীর হয়ে বাচ্চারা তাকে চিৎকার করে স্বাগত জানায়, এসো ঘের্লাস! তোমার তরোয়ালগুলো দেখাও–একবার আমাদের ওগুলো দেখতে দাও।

জাদুকর ঘের্লাস মিষ্টি করে হাসে, বাচ্চাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। সাবধানে এসে দাঁড়ায় যাতে বাচ্চাদের কারো গায়ে ধাক্কা না লাগে। গাড়িটার পেছন থেকে একগোছা খড় টেনে বের করে। ঘোড়াটাকে খেতে দেয়। ঘোড়াটার ভেজা চোখে আদরের চাপড় দেয়।

লোকজন তখনও আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সারা গাঁয়ের লোক সেখানে এসে জড়ো হয়। ওকে ঘিরে দাঁড়ায়। দর্শকদের আগ্রহ লক্ষ্য করে ঘের্লাস তখনই খেলা শুরু করে।

মঞ্চ বলে কিছু নেই। কাজেই ঘের্লাস একটা চেয়ারে উঠে দাঁড়ায়। কাঁচ খেতে থাকে। নাক দিয়ে বের করে উজ্জ্বল রঙিন ফিতে, আংটি, ডিম, ধাতুর মুদ্রা। তারপর হাত দিয়ে জাদুর ভঙ্গি করে ওর দোমড়ানো টুপি থেকে বের করে দুটো সাদা পায়রা।

চাষীরা প্রচন্ড খুশি হয়। প্রাণপণে হাততালি দেয়। তারস্বরে চিৎকার করে, সাবাস ঘের্লাস–সাবাস বুড়ো ঘের্লাস।

এসবের শেষে ঘের্লাস তার সবচেয়ে মনমাতানো খেলা শুরু করে। খেলাটা হলো তিনটে তলোয়ার গেলা।

যে মুহূর্তে ঘের্লাস ওর কোমরের বেল্ট-এ গোঁজা তিনটে তলোয়ার বের করে–রোদে ঝলসে ওঠে

সেগুলো। দর্শকেরা সব চুপ হয়ে যায়–উদ্বেগের সঙ্গে জাদুকরের কাণ্ডটা দেখে।

খেলার শুরুতে ঘের্লাসি তলোয়ার তিনটে চাষীদের মাথার ওপর শূন্যে ঠং-ঠং শব্দ করে ঘুরিয়ে দেয়। তারপর একটা একটা করে তলোয়ার গিলতে থাকে। মুখটা হাই তোলার মতো বিরাট হাঁ করে শেষ তলোয়ারটা মুখে পোরে। এবার ঘের্লাসি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, দুদিকে দুহাত তুলে দেয়–দেখতে লাগে যেন মোটা মাথা ক্রশ। এভাবে ও কয়েক মিনিট থাকে–শূন্যে যেন ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায়।

খেলার শেষে চাষীরা নিজেদের খেয়াল-খুশি আর সাধ্যমত ওর জাদু-টুপিতে মুদ্রা ছুঁড়ে দেয়।

ঘের্লাসির জীবন বরাবর এরকম ছিল না। প্রায় এগারো বছর আগে ঘের্লাসি তা'বড় তা'বড় সব পৃথিবীর সেরা জাদুকরদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। সমস্ত য়ুরোপের সব সার্কাসের ব্যবস্থাপক ও ম্যানেজাররা ওকে অকল্পনীয় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দলে নিত। বড় বড় শহরের দেয়ালে পোস্টার সাঁটা হতো। তাতে যতটা বড় করে সম্ভব ঘের্লাসির ছবি থাকত। ঘের্লাসি তখন ছিল একেবারে উড়নচণ্ডে। বৃদ্ধ বয়েসে যে ঝামেলায় পড়তে হতে পারে একথা ও ভাবতোই না।

বছরের পর বছর কেটে গেছে। দিন দিন ওকে করেছে দুর্বল আর রোগার্ত। তারপর ঘের্লাসি একদিন বৃদ্ধ দরিদ্র আর একা হয়ে গেল। এখন আর কেউ ওর ফিতে আর পায়রার খেলা নিয়ে ভাবে না। তিনটে তলোয়ার বাঁট পর্যন্ত গিলে ফেলার খেলা বিদেশী ভদ্রলোক দর্শকদের ঘৃণার উদ্রেক করে। কাজেই ও একদিন পরিত্যক্ত হলো। ফিরে এল নিজের বাড়িতে।

মফস্বল শহরগুলো আর গ্রামাঞ্চল ওকে প্রচণ্ড উৎসাহে বরণ করে নিল। নতুন করে ঘের্লাসির গৌরবের দিন শুরু হলো। অবশ্য এই গৌরব এখন সস্তা, গেঁয়ো আর অর্থহীন। ঘের্লাসি এখন উন্মুক্ত জায়গায় ওর খেলা দেখায় ক্লান্ত ঘোড়া আর টাল খাওয়া চাকার গাড়ির পাশে।

কিছুদিন আগে ঘের্লাসি একটা গ্রামে এল। এই গ্রামে এর আগে ও কখনো আসেনি। তাই চাষীরা দলে দলে জড়ো হলো। ওর তাক-লাগানো খেলার কথা তারা অন্যদের কাছ থেকে শুনেছিল। তাই স্বচক্ষে দেখতে এল।

গ্রামাঞ্চলে খেলা দেখানো শুরু করা থেকে ও এত উদ্দীপনা আর কোনো গ্রামে দেখেনি। এই উদ্দীপনা ওকে

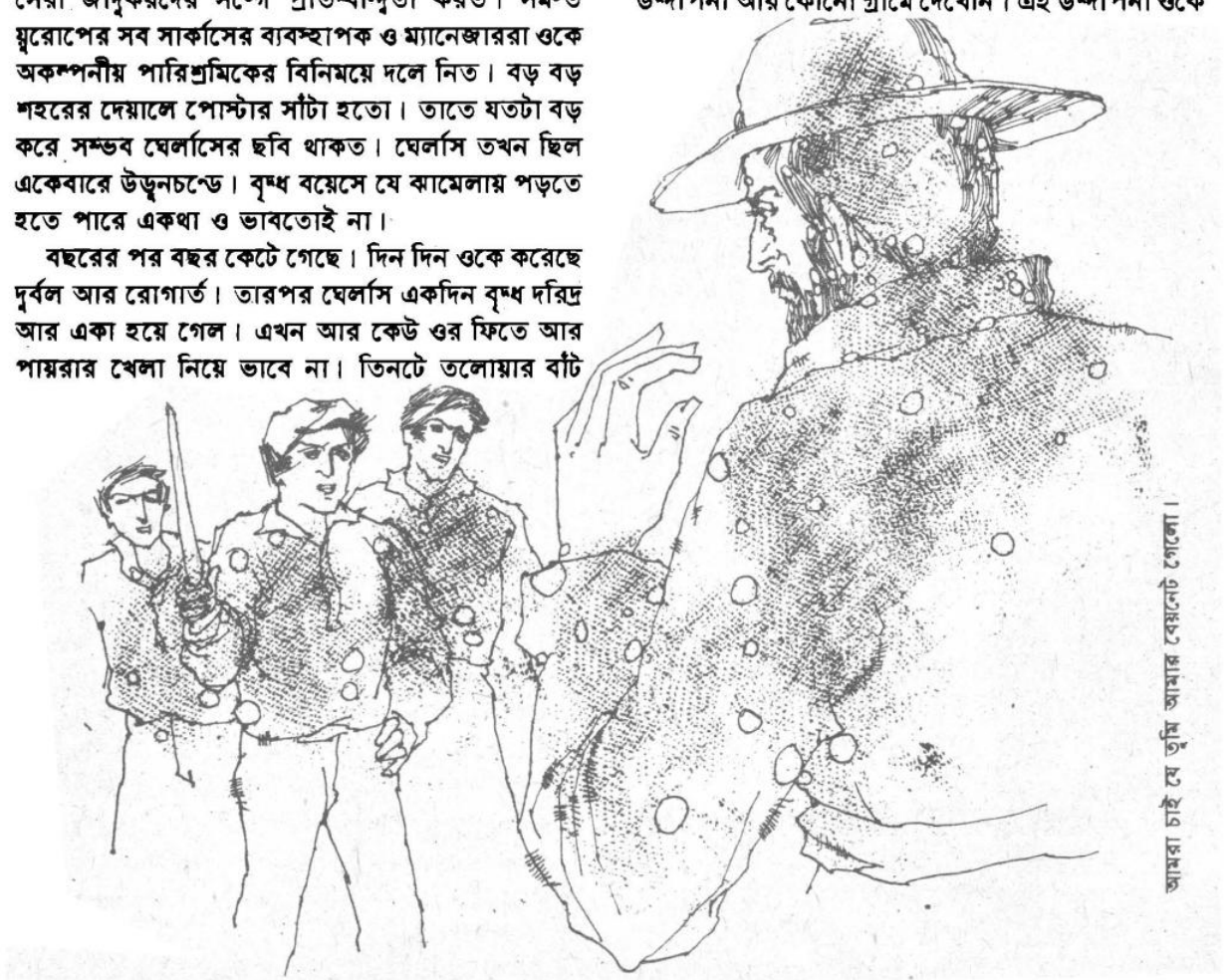

মনে করিয়ে দিল ওর সেই য়ুরোপীয় সার্কাসের গৌরবময় মুহূর্তগুলো। ও মনোযোগ দিয়ে খেলা দেখাতে লাগল।

প্রথম থেকেই দর্শকরা উল্লাসধ্বনি তুলল, ভালো বুড়ো ঘের্লাস! তেজী মরদ!

ওদের উদ্দীপনা আরো বেড়ে গেল যখন ঘের্লাসের তিনটে চক্‌চকে তরবারি রোদে ঝল্‌সে উঠল। তারপর তরবারি তিনটে ওর মুখগহ্বরে অদৃশ্য হলো। নতুন করে বাহবা ধ্বনি উঠল।

হঠাৎ জনতার কলরব ছাপিয়ে কার কর্কশ চিৎকার শোনা গেল, মিথ্যেবাদী! এই জাদুকর লোক ঠকাচ্ছে। ওর তলোয়ারগুলো আসল নয়। ও যদি আমার বেয়নেট গিলতে পারে তবেই ওকে আমরা বিশ্বাস করবো। বক্তা সেই গ্রামের সার্জেন্ট।

ঠিক, ঠিক। ও আমাদের সার্জেন্টের বেয়নেট গিলুক। ও আমাদের ঠকিয়ে পয়সা নিচ্ছে। ঘের্লাস ঠগ!

শ'য়ে শ'য়ে চাষী যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। গাঁয়ের সার্জেন্ট ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ঘের্লাসের চেয়ারের কাছে এল। বলল, মিহেল ঘের্লাস–আমি বলছি–যদি তুমি চাও যে আমরা তোমায় বিশ্বাস করি তবে তোমাকে আমার বেয়নেট গিলতে হবে–তোমার ঐ তারের টুকরো নয়। তোমার মতো লোকদের আমি মেলায় দেখেছি–দর্শকদের ঠকিয়ে পয়সা কামায়। কিন্তু এখানে আমি গ্রাম কর্তৃপক্ষের লোক–তাই তোমাকে লোক ঠকাতে দেব না।

ঠিক, ঠিক। ঘের্লাস জোচ্চোর। ওর লজ্জিত হওয়া উচিত। জঘন্য বুড়ো জাদুকর! ধিক!–জনতার মধ্যে থেকে শোনা গেল।

জনতা বেড়ালের ডাক ডাকল, মারমুখো হয়ে ঘের্লাসের দিকে এগিয়ে গেল।

এরকম পরিস্থিতিতে ঘের্লাস আগে কখনও পড়েনি। ওরা ওকে গালাগাল দিচ্ছে কেন? ওরা যে ওকে ঠগ বলেছে, কেউ কি ওদের মধ্যে পারবে তলোয়ার গিলতে? সার্জেন্টও কি পারবে? নিশ্চয়ই পারবে না। ঘের্লাস ভাবল ও কি ওদের চ্যালেঞ্জ করবে অথবা তরবারিগুলো ওদের হাতে দেবে পরীক্ষা করবার জন্য। ওকে অপদস্থ করতে কে সাহস করবে ঐ তরবারিগুলো গিলতে?

এমন কি ওর ঘোড়াটাও মনে হলো আশ্চর্য হয়েছে। দু কান নাড়ল ঘোড়াটা।

অবশেষে জাদুকর ঘের্লাস ডান হাতে তলোয়ার তিনটে তুলে ধরল। সে বলল, এগুলো তলোয়ার। হাতে নিয়ে পরখ করে দেখুন। চল্লিশ বছর যাবৎ এগুলো আমি আমার গলায় ঢোকাচ্ছি। কাউকে কক্ষণো ঠকাইনি। আমি সৎ।–তারপর ও তলোয়ারগুলো দর্শকদের হাতে দিতে গেল। কিন্তু দর্শকরা ওর কথা শুনবে না। কেউ তলোয়ারগুলো ছুঁলো না।

সার্জেন্ট বলল, তোমার তলোয়ারের ব্যাপারে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমরা চাই যে তুমি আমার বেয়নেট গেলো। তারপর আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো।

দর্শক জনতা আবার চিৎকার করে উঠল, ঠিক, ও সার্জেন্টের বেয়নেট গিলুক। ও আমাদের ঠকিয়ে পয়সা লুটছে। ঘের্লাস দেখল যে ওর অস্তিত্বই বিপন্ন। ওর এত বছরের খ্যাতি চিরদিনের জন্য অপমানের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। তলোয়ার তিনটে ও কোমরে গুঁজে রাখল। এই তলোয়ারগুলো ছিল পৃথিবী-বিখ্যাত। ও কাঁপা কাঁপা হাতে সার্জেন্টের বেয়নেটটা নিল।

ও সন্দেহের ভঙ্গিতে বেয়নেটটা শূন্যে একবার ঘুরিয়ে নিল। বেয়নেটটা রোদে ঝলসে উঠল না। এটা তেলা তেলা। ঘের্লাস জামার হাতায় ওটা মুছে নিল।

সার্জেন্ট ঠাট্টার ভঙ্গিতে হাসল। বিমূঢ়ের মতো দর্শক জনতা অপেক্ষা করতে লাগল।

চেয়ারে-বসা জাদুকরকে মনে হলো টল্‌ছে। ঘের্লাস দু আঙুলে বেয়নেটটা ধরল। তারপর গলায় ঢোকাতে লাগল। অর্ধেকটা গেলার পর ও তাড়াতাড়ি বেয়নেটটা বের করে নিল। আবার বেয়নেটটা জামার হাতায় মুছে নিল। তারপর সবটা গলার মধ্যে পুরে দিল। শুধু বাঁটটা আর সেখানে বাঁধা হলুদ ফিতেটা বাইরে রইল। ওর থুতনির ওপর হলুদ ফিতেটা ঝুলতে লাগল। ও হাত দুটো ছড়িয়ে দিল–একটা ক্রুশের ভঙ্গিতে রইল। আহত পাখির মতো ওর শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠল যেন পাখিটা ওড়বার চেষ্টা করছে।

ঝড়ের শব্দের মতো সাবাস ধ্বনি উঠল। পাগলের মতো চাষীরা চিৎকার করে উঠল, সাবাস ঘের্লাস! ঘের্লাস যুগ যুগ জীও।

একটা হতাশার ভঙ্গি করে ঘের্লাস বেয়নেটের বাঁটটা ধরল। যে মুহূর্তে ও বেয়নেটটা বের করে নিল, সঙ্গে সঙ্গে ওর গলা থেকে গল গল করে রক্ত উঠে এল।

ও কথা বলতে চাইল। করুণভাবে ও তোতলাতে লাগল। তারপর জাদুকর ঘের্লাস সার্জেন্টের বেয়নেটের কাছে মাটিতে পড়ে গেল। পাশেই ওর মঞ্চ অর্থাৎ ছোট্ট একটা চেয়ার।

ছবি: অলয় ঘোষাল

জল-জঙ্গলের দেশে

শচীন দাশ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পিংকির মন খারাপ হয়ে গেলো।

মন খারাপ করে সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নেমে আসছিল, হঠাৎ দেবাঞ্জনমামার চিৎকারে পিংকি চমকে উঠল–এই যে ছোট্টু–শিগগির আয় এদিকে–

কাছাকাছি যেতেই দেবাঞ্জন বললো, এই দ্যাখ, দেখেছিস, বনবিবির মন্দির–

–বনবিবি! পিংকি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

নামটা শুনেছে, অথচ ঠিক বুঝতে পারছে না কোথায় শুনেছে। তবু ভাবতে ভাবতে মন্দিরের সামনেই নিচু হয়ে বসে পড়লো। খুব বড় নয়। ছোট্ট একটা মাটির ঘর। ওপরে খড়ের ছাউনি। তারই ভেতরে তিন চার ধরনের মাটির মূর্তি। কিন্তু মূর্তিগুলো কার? পিংকি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই কুট্টিমামারা এসে পৌঁছল সেখানে।

দেবাঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা কানাইদা এটাই তো বনবিবির মন্দির তাই না?

–হ্যাঁ। ওই তো দক্ষিণ রায় মাঝখানে। আর ওপাশে দেবী বিশালাক্ষ্মী বা বনলক্ষ্মী।

–শুনেছি এদের পুজো না দিয়ে জঙ্গলে ঢোকে না কাঠকাটারা?

–শুধু কাঠকাটারাই নয়! মউলে থেকে শুরু করে যেই জঙ্গলে যায় সেই বনবিবি বা বনলক্ষ্মীর পুজো না দিয়ে ঢোকে না।

–আহা ব্যাপারটা একটু খুলেই বলুন না–কানাই সরকারের সামনে এসে বিপিন জানা বললো, তাহলে শোনো খোকাবাবু। মুসলমানরা যাকে বলে 'বনবিবি', হিন্দুরা তাকেই বলে বিশালাক্ষ্মী বা বনলক্ষ্মী।এদিকের লোকের বিশ্বাস, বিশেষ করে যারা জঙ্গলে যায়, তারা মনে করে বনবিবি বা বনলক্ষ্মীকে পুজো দিয়ে সন্তুষ্ট করে জঙ্গলে না ঢুকলে বিপদ অনিবার্য। বাঘ, কুমীর বা সাপকোপের পাল্লায় পড়তে পারে। কেননা জঙ্গল তো তারই এলাকা। সেজন্যই এই বিশ্বাস থেকে এরকম একটা নিয়ম গড়ে উঠেছে।

কথা বলতে বলতে দেবাঞ্জনমামা ক্যামেরা রেডি করছিল, ঠিক সেই সময়েই একটু দূরে একটা বড় পাখি কোত্থেকে এসে উড়ে বসল। দেবাঞ্জন তাকাতেই পিংকি লাফিয়ে উঠল, দেবাঞ্জনমামা এ পাখিটার একটা ছবি তোল। কী সুন্দর দেখতে–

কুট্টিমামা বলল, হ্যাঁ খুবই সুন্দর। তবে এ পাখি কিন্তু আমাদের দেশীয় পাখি নয়। এরা সারসেরই শ্রেণীভুক্ত। তবে ঠিক সারস নয়। মনে হয় মাইগ্রেটারী বার্ড।

কথাটা বিপিন জানাকে জিজ্ঞেস করাতে বিপিন জানাও স্বীকার করল।

কথায় কথায় বেলা বেড়ে গিয়েছিল, রেঞ্জার সাহেব নিচে এসেই বললেন, কই কানাইবাবু চলুন–চলুন আপনাদের খানিকটা জঙ্গল দেখিয়ে আনি–

প্রথমে কানাই সরকার, পরে কুট্টিমামা ও তারও পরে পিংকিরা সবাই রেঞ্জার সাহেবের পেছনে পেছনে

জেটিতে উঠতেই কানাই সরকার বলল, স্যার কি লঞ্চ-এ যাবেন নাকি ?

–হ্যাঁ। লঞ্চই ভালো। সুধন্যখালির দিকে এ সময়টা বড় নির্জন। ভটভটিতে না যাওয়াই ভালো।

কথাটা শুনে পিংকিরা যে ভটভটিতে এসেছিল সেই ভটভটির একজনকে চেঁচিয়ে বলল বিপিন জানা। জানাল তাকে এখানেই থাকতে; তারা খানিকক্ষণ ঘুরে আসছে।

লঞ্চ ছাড়ল একটু পরে।

এখন প্রায় দুপুর। নদীর হাওয়ায় খিদেও পেয়েছিলো খুব।

কিন্তু পিংকি কিছু বলার আগেই রেঞ্জার সাহেব একজন খালাসিকে ডাকলেন। ফিসফিস করে তাকে কী বলতেই সে দৌড়ে নিচের ডেকে চলে গেল। একটু পরে যখন আবার উঠে এলো, তার হাতে তখন এক ছড়া পাকা কলা। সঙ্গে ঠোঙায় ও কী যেন নিয়ে এসেছে।

রেঞ্জার সাহেব বললেন, নাও পিংকি নাও–খেতে খেতে জঙ্গল দেখ। ওই কলা আর বিস্কুট দিয়েই এখন চালাতে হবে। জঙ্গলে এসেছো, এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা কিন্তু এখন করতে পারলাম না ভাই–

রেঞ্জার সাহেবের কথায় পিংকি লজ্জা পেয়ে গেলো। আর একটু তাকিয়ে কলা আর বিস্কুট খেতে খেতে দু'মিনিটের ভেতরেই সে রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললো

মানুষটিকে যত গম্ভীর ভেবেছিলো ততটা গম্ভীর তিনি নন। আলাপ একটু জমতেই পিংকি এবার সাহস নিয়ে এগিয়ে গেলো।

একটা ব্যাপার অনেকক্ষণ থেকেই বলব বলব করছিল পিংকি, কিন্তু ঠিক সুযোগ হচ্ছিল না; এবার সুযোগ পেতেই জানতে চাইল, আচ্ছা কাকু তোমার ওখানে যে বোঝাই করা শুধু বড় বড় কাঠ দেখলাম ওগুলো কিসের ?

–এই...এটাই তো কথা। এসবই তো এখানকার প্রধান সমস্যা।

–সমস্যা ! কিসের কাঠ চুরির ?

পিংকি নয়, কথাটা শুনে দেবাঞ্জনমামা উত্তর দিতেই রেঞ্জার সাহেব জানালেন, হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন। নতুন নতুন গাছপালা যত না হচ্ছে তার চেয়ে গাছ কাটা চলছে বেশি পরিমাণে। তাও অর্ধেকের ওপরই চুরি হচ্ছে। এভাবে যদি চুরি হয় তাহলে দেখবেন সুন্দরবনের জঙ্গল একদিন ফরসা হয়ে আসবে।

দেবাঞ্জন উসখুস করছিল। এবারে বলল, তা আপনারা তো জঙ্গলে গিয়ে গাছ কাটার পারমিশান দিচ্ছেন তবে এভাবে চুরি হচ্ছে কেন ?

–সেটাই তো কথা। তাহলে বলি শুনুন।

কী বলবে কথাটা শোনার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ল পিংকি; একটু এগিয়ে দেবাঞ্জনমামার কাছ ঘেঁষে বসতেই রেঞ্জার সাহেব পিংকির দিকে মুখ ফেরালেন, পিংকিবাবু হয়তো এখন এতসব বুঝতে পারবে না, তবু বলি–কেননা ব্যাপারটা আপনাদের বোঝা দরকার।

বলে কুট্টিমামা থেকে সবার দিকে একবার করে তাকিয়ে রেঞ্জার সাহেব মুখ খুললেন। –বুঝলেন তো গরীবের দেশ। অর্ধেকের ওপর মানুষ এই লাট-অঞ্চলে একবেলা, আধবেলা খেয়ে থাকে। কী করবে কাজ কোথায় ! তাই জঙ্গলই ওদের ভরসা। এই জল-জঙ্গলের নানা জায়গা থেকে কত লোক কত কিছু নিয়ে আসছে বলুন তো ? কেউ মাছ, কেউ কাঁকড়া, কেউ কাঠ-মধু বা গোলপাতা; শুধু তাই নয় ধানী ঘাস আর জ্বালানীর জন্যও অনেকে চলে যায় জঙ্গলে। পারমিশান না নিয়েই এসব নিয়ে আসে। পারমিশান নেবার জন্য যে অর্থ বন-দপ্তরকে দিতে হয় তাও তাদের নেই।

কুট্টিমামা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবারে বলল, কিন্তু মি: গাঙ্গুলী তা না হয় নেই বুঝলাম; কিন্তু বড় নৌকা নিয়েও তো অনেককে আমি কাঠ চুরি করে আনতে দেখেছি। এদের কি পয়সা নেই বলছেন ?

–না, তা কেন ! আমি সে কথায়ই আসছি।এই এদের ধরার জন্যই তো নদী-নালায় আমাদের পেট্রোল-গার্ডরা ঘুরে বেড়ায়।আর ধরা পড়লে নৌকার সব কাঠই চলে আসে আমাদের অফিসে। তারপর প্রয়োজন মতো আমরা সেগুলো নীলামে বিক্রী করি–

–ও হো ওগুলো তাহলে নীলামের কাঠ–

পিংকির কথায় রেঞ্জার সাহেব তপন গাঙ্গুলী জানালেন, হ্যাঁ সবই নীলামের জন্য রাখা হয়েছে। কালকেই নীলামের তারিখ।

কথায় কথায় কারোই খেয়াল ছিল না। হঠাৎ বিপিন জানা চিৎকার করে উঠল, পিংকুবাবু ওই দেখ বাঁদর; তার মানে কাছাকাছি হরিণও আছে কোথায়ও–

পিংকি ততক্ষণে প্রায় লাফিয়েই লঞ্চের একধারে চলে এসেছে।

–কই, কোথায় ?

–ওই দেখ, দুটিতে কেমন ফল খাচ্ছে আর গা চুলকোতে চুলকোতে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে।

খালি চোখে দূর থেকে পিংকিরও তখন চোখে পড়েছিল দৃশ্যটা। কিন্তু ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিল না। না পাওয়ায় এখন কুট্টিমামার দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, কুট্টিমামু তোমার দূরবীনটা দাও তো–

দূরবীন নিয়ে ভালো করে দেখতে দেখতেই পিংকি অবাক হল। বাঁদর দুটো মাঝে মাঝে নিচের দিকে তাকিয়ে কী দেখছে আর সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে সরু সরু ডালপালা আর পাতা ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে নিচের দিকে।

ব্যাপারটা সবাইকে বলতেই বিপিন জানা জানাল, ওই যে বললাম, হরিণ আছে কাছাকাছি। হরিণদের দেখেই ওরা গাছের ডাল ভেঙে নিচের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে–

–বাঃ অদ্ভুত তো!

–শুধু তাই নয়–বিপিন জানা বলল, সুন্দরবনের এ সব জঙ্গলে হরিণের সঙ্গে বাঁদরের খুব বন্ধুত্ব। এরা গাছের পাতা আর কচি-ডাল ভেঙে যেমন হরিণদের খেতে দেয় তেমনি আবার গাছের মগডালে উঠে দূরে বাঘের আগমন টের পেলেই হরিণকে সাবধান করে দেয়। পরিবর্তে বাঁদর-গুলো মাঝে মাঝে হরিণের পিঠের ওপরে বসে দিব্যি জঙ্গল চষে বেড়ায়। হরিণও তার কৃতজ্ঞতা জানাতে বাঁদরকে কিছু বলে না।

–বাঃ দারুণ তো। এমন একটা দৃশ্য দেখতে পারলে ঠিক ছবি তুলে নিতাম।

দেবাঞ্জনমামার কথায় বিপিন জানা হাসল। বলল, তা কি করে পাবেন! হঠাৎ এসে হঠাৎ এসব দৃশ্য দেখা যায় না। তার জন্য জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে হয়। আসলে বনের জন্তু-জানোয়ারেরা খুব চালাক। মানুষের গায়ের গন্ধে তারা বুঝতে পারে, মানুষ এসেছে জঙ্গলে।

পিংকি জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ওগুলো কি...ওই যে নালার মতো নদী থেকে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে গেছে?

ঠিক কাউকে লক্ষ্য করে সেভাবে বলেনি, তবু পিংকির কথায় রেঞ্জার তপন গাঙ্গুলীই বলে উঠলেন, না–ওগুলো ঠিক খাল নয়। ওগুলো খাঁড়ি। জঙ্গলের ভেতরে এ রকম অসংখ্য খাঁড়ি ঢুকে গেছে। তাতে জলও আছে। অনেকে একে ঝোরাও বলে। ...তা যাবে নাকি একবার ওখানে?

রেঞ্জার সাহেবের কথায় যত না পিংকি অবাক হয়েছিল তার চেয়ে বেশি অবাক হল এখন দেবাঞ্জন আর তড়িৎ।

প্রায় একসঙ্গেই দু'জনে বলে উঠল, সত্যি...যাওয়া যাবে ওখানে–!

রেঞ্জার সাহেব হাসলেন।

বনবিবির মন্দির

–সত্যি নয় কি, আমি ঠাট্টা করছি।...নুরেশ...নুরেশ–

রেঞ্জার সাহেব ডাকতেই খাকি রঙের প্যান্ট-শার্ট পরা একজন এগিয়ে এল।

সাহেব বললেন, সামনের ওই ঝোরার সামনে লঞ্চ থামাতে বল। ওদের একবার জঙ্গলটা দেখিয়ে দিই–

সাহেবের আদেশ পেয়ে নুরেশ চলে যাচ্ছিল; রেঞ্জার সাহেব আবার ডাকলেন, আর হ্যাঁ–শোনো নুরেশ?

নুরেশ ফিরতেই সাহেব বললেন, বন্দুক নিও কিন্তু। সেই সঙ্গে কেটাসেট-এর ফাইল। কেটাসেট কিন্তু লোড করে নেবে বন্দুকে–

এতক্ষণ নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে ও নানান গল্পে ডুবে ছিল পিংকি; বেশ ভালো লাগছিল তার। কিন্তু এখন জঙ্গলে নামা ও বন্দুকের কথায় বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। যাক্, স্কুলে গিয়ে এবার তাহলে বলার মতো একটা কথা পাবে পিংকি। ক্লাস টীচার থেকে ক্লাসের বন্ধুরা সবাই খুব হিংসে করবে পিংকিকে। করারই কথা। কেননা এই বয়সে এমন জঙ্গলে বাঘের রাজত্বে নামা কী সোজা কথা। তাও কী, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বলে কথা। গর্বে পিংকির বুক ফুলে উঠল। আবার মনে মনে একটু ভয়ও হল এখন। এই জন্তুটা তো খুব চালাক শুনেছে। ভয়ংকর বুদ্ধি! নিঃশব্দে শিকার তুলে নিয়ে চলে যায়। শেষে যদি–

[চলবে]

ছবি : দেবাশিস রায়

হাঁদা-ভোঁদার

বক্সিংয়ের টিকিট

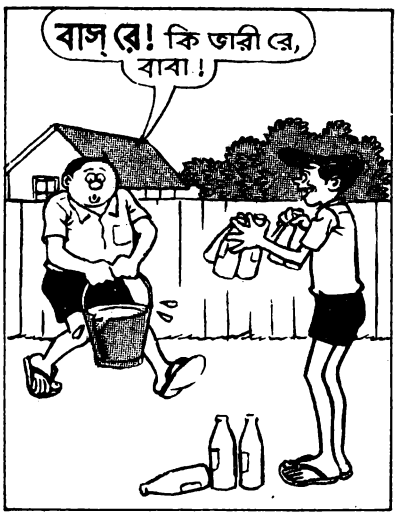

হেঃ হেঃ! তোর গরম মাথা একটু নরম হয়েছে মনে হচ্ছে, ভোঁদা!
তুই এখানে ঘুমো, ভোঁদা! আমি বোতল বেচে পয়সা সংগ্রহ করি বক্সিংএর লড়াই দেখার জন্যে।
বক্সিং দেখার একটা টিকিট কিনেছি।
আমার টিকিটটা আমি নিলুম, হাঁদা!
এঃ!
মরেছে! আমি পা রাখতে পারলাম না! আমি পেছন দিকে পড়ে যাচ্ছি!
হেঃ হেঃ! যেই ও নেমে আসবে ওকে ক্যাঁক করে চেপে ধরবো!
এ দড়ি তোর তরী তীরে এনেও ডুবিয়ে দিলো রে, ভোঁদা হিঃ হিঃ!
ওঁয়াফ্‌স!
হোঃ হোঃ! ডোবেনি রে, হাঁদা! মনে হচ্ছে তরীর ধাক্কায় তোকেই গড়াগড়ি খেতে হবে!
আমার ফিরে আসার গতিবেগ ও বুঝতে না পারার ধাক্কায় বেচারা বেহুঁশ হয়ে পড়েছে, হেঃ হেঃ! তাড়াতাড়ি করলে আমি প্রথম রাউণ্ডের আগেই পৌঁছে যাবো!
গোঁ গোঁ! আমি কোথায়?

ডাঃ সুশীলকুমার দে স্মৃতি সাহিত্য
প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প

গণশার ভুল

সুজিতকুমার বসাক

অনেক দিন আগেকার কথা।

ফুলবাড়ি গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পন্ডিত একটা টোল খুলেছিলেন। আশেপাশের গ্রাম থেকেও অনেক ছাত্রছাত্রী সেখানে পড়তে আসতো। গ্রামের উত্তর দিকে একটা বট গাছের ছায়ায় পড়াশুনা হতো। পাশেই পন্ডিত-মশাইয়ের বাড়ি। আপনজন বলতে তাঁর কেউ ছিল না। পন্ডিতমশাই খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াতেন। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসীদের বিপদে আপদেও তিনিই আগে এসে

গণশা একটা আমগাছ সরানোর চেষ্টা করছে

দাঁড়াতেন। কিন্তু টোলের একটা ছাত্রকে পন্ডিতমশাই কিছুতেই বাগে আনতে পারতেন না। ভারী দুষ্টু সে। নাম গণেশ। সবাই খ্যাপা গণশা বলেই ডাকতো। গণশার সব সময় গন্ডগোল–এর সংগে মারামারি ওর সংগে মারামারি এই করতো কেবল। গ্রামের লোক কেউ গণশাকে দেখতে পারতো না।

পন্ডিতমশাই উপরে উপরে গণশাকে ধমক দিলেও অন্তরে কিন্তু খুবই ভালোবাসতেন। কারণ গণশার কয়েকটা গুণ ছিল–ও খুব ভালো গান গাইতে পারতো আর কেউ বিপদে পড়লে ও ভুলে যেত সব শত্রুতা।

তবে ও নিজে যা ভালো বুঝবে তাই করবে। কারও কথা শুনবে না। এমন কি মাঝে মাঝে পন্ডিতমশাইয়ের কথাও শুনত না। তখন পন্ডিতমশাই নিজেকে ঠিক রাখতে পারতেন না। বসিয়ে দিতেন গোটাকতক বেতের ঘা।

সে বছর বর্ষার শুরুতেই এক বিপর্যয় ঘটে গেল। প্রচন্ড ঝড়ে ঘরবাড়ি গাছপালা ভেঙে একেবারে তছনছ। পন্ডিতমশাইয়ের ঘরটাও ভেঙে গেল ঝড়ে।

অবস্থা ভয়ানক রূপ ধারণ করেছিল। রাস্তাঘাট বন্ধ। বহু লোক ঘরছাড়া।

পন্ডিতমশাই টোলের সব ছাত্রদের ডেকে বললেন, তোমরা গ্রামের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ, তাই তোমাদের এখন গ্রামের সেবায় লাগতে হবে। প্রথমে তোমরা সবাই মিলে রাস্তার গাছপালা সরিয়ে পরিষ্কার কর, একদল দক্ষিণ পাড়ায় যাও আর একদল উত্তর পাড়ায় যাও।

সব ছাত্র সম্মতি জানালেও গণশা কিন্তু বেঁকে বসল। বলল, আমি একাই পারি, আমি উত্তর পাড়ায় যাব একাই।

পন্ডিতমশাই রেগে গেলেও শান্ত কণ্ঠে বললেন, ঠিক আছে, তুমি উত্তর পাড়ায় যাবে আর সবাই যাবে দক্ষিণ পাড়ায়।

পন্ডিতমশাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সবাই বেড়িয়ে পড়ল। সবাই গেল দক্ষিণ পাড়ায় আর গণশা একাই গেল উত্তর পাড়ায়।

বিকেল হতেই সব ছাত্ররা দক্ষিণ পাড়ার রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে চলে এল। কিন্তু গণশা ফিরে এল না। একঘন্টা গেল–দুঘন্টা গেল তবু গণশা আসে না।

তখন ছেলেরা সবাই পন্ডিতমশাইয়ের সংগে উত্তর পাড়ায় গেল। গিয়ে দেখল গণশা একটা বড় আমগাছ সরানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তার কপাল দিয়ে

দর দর ঘাম পড়ছে।

পন্ডিতমশাই গণশাকে কাছে ডাকলেন। তারপর অন্য ছেলেদের বললেন গাছটা সরাতে। সকলে মিলে নিমেষে গাছটা সরিয়ে ফেলল। পন্ডিতমশাই গণশাকে বললেন, দেখলে তো গণেশ, কত সহজে কাজটা হয়ে গেল।

গণেশ এবার নিজের ভুল বুঝতে পারলো। পন্ডিতমশাইয়ের কাছে ক্ষমা চাইল সে। পন্ডিতমশাই তার মাথায় হাত রেখে বললেন, দীর্ঘজীবী হও, দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।

ছবি : সুফি

ডাঃ সুশীলকুমার দে স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প

পদ্মপুকুর

বরদাপ্রসাদ চক্রবর্তী

দামোদর নদের বাঁকের উপর খেট্টাডিহি গ্রাম। লাল কাঁকুরে মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে গ্রামটি। একেবারে ছোট নয়। আঠারো পাড়া। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে জুনিয়র হাই-স্কুল। স্কুল আর কয়েক বিঘে জমি পেরিয়ে খেট্টাডিহি গ্রামের আর একটি পাড়া রতনপুর।

সে বছর আশ্বিনে পা দিতেই হাহাকার উঠল রতনপুরের বুকে। জল! জল! আজ দু বছর অনাবৃষ্টি। পাড়ার মধ্যে একটি মাত্র জলাশয়—নাম পদ্মপুকুর। পুকুরের বুকে শেওলার বদলে ঘাস গজিয়েছে। হাহাকার আরও বাড়ল যখন পাড়ার পাতকুয়োটিও শুকিয়ে গেল। এখন জল আনতে হয় দামোদর না হয় দাঁতীন ঝর্ণা থেকে। দুদিকেই প্রায় এক মাইল দূরত্ব। ভোর হতে না হতে জল আনার কাজ আরম্ভ হয়। কেউ কাঁধে, কেউ বাঁকে, কেউ বা গরুর গাড়ি করে জল আনে। প্রতিদিন জগবন্ধু মাস্টারও পাড়ি দেয় জল আনতে সাত সকালে। সেদিন দাঁতীন ঝর্ণার পাশে দাঁড়িয়ে জগবন্ধু ভাবল, কত জল বয়ে যাচ্ছে ব্রহ্ম-ডাঙার বুক চিরে। এই জলকেই যদি নিয়ে যাওয়া যায় রতনপুরের পদ্মপুকুরে! কোথাও বাঁধ দেওয়া, কোথাও খাল কাটা, এই তো কাজ। সেদিন এক রাশ চিন্তা নিয়ে ফিরে এল জগবন্ধু মাস্টার। পাড়ার মাতব্বর সুবলের সঙ্গে দেখা করে বলল, আমি একটা কাজ করতে চাই সুবল। না, না, টাকা পয়সা কিছু চাই না। এ পাড়ায় তোমরা যত লোক আছ সকলে দু ঘন্টা করে শ্রম

দাঁতীন ঝর্ণার জল পড়েছে পদ্মপুকুরের বুকে

আমাকে দেবে। এই আমার অনুরোধ।

—কী করবেন মাস্টারবাবু?

—দাঁতীন ঝর্ণার জল নিয়ে আসব পদ্মপুকুরে।

—বলেন কী মাস্টারবাবু! অবাক হয়ে বলে উঠে সুবল ঘোষ।

—তোমরা চাষী মানুষ। দিনে তোমাদের অবসর নেই। এখন শুক্ল পক্ষ। চাঁদনী রাত। সামনে পূজো। আমাদের কাজ হবে রাত্রিতে। সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত নটা। দেখি না কতদিন লাগে। তুমি সকলকে বলে রেখ সুবল।

বোধনের রাত থেকে আমাদেরও আরম্ভ হবে শুভ উদ্বোধন!

সুবলের মুখে আর কথা সরে না। জগবন্ধু মাস্টারের পায়ের ধুলো নিয়ে তখনই ছুটল কথাটা জানিয়ে দিতে সকলকে। কদিন কেটে গেল। বোধনের দিন এল। পুব পাড়ায় বোধনের ঢাক বেজে উঠল। জগবন্ধু মাস্টার পঞ্চাশজন লোক নিয়ে হাজির হলো দাঁতীন ঝর্ণার কাছে। পঞ্চাশজন লোককে ভাগ করল দশটি দলে। তারপর তৃষ্ণারূপী শক্তিদায়িনী মাকে স্মরণ করে কাজ আরম্ভ করল। রাত নটার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হলো কাজ। এভাবেই কাজ এগিয়ে চলল। কোথাও গর্ত ভরল। কোথাও শুধু বাঁধ দিল। আবার কোথাও বা উঁচু ঢিপির বুক চিরে কেটে চলল মাটি। ষষ্ঠীর চাঁদ পৌঁছল কোজাগরী পূর্ণিমায়। সেদিনও কাজে লেগে পড়েছে সকলেই। কাজ প্রায় সমাপ্তির দিকে। আর দুদিন কাজ করলেই জলের বাঁক ফেরানো যাবে। রাত ন'টা বাজতেই কাজ বন্ধ করতে অনুরোধ করল জগবন্ধু মাস্টার। কিন্তু সেদিন সকলেই কাজে মেতে উঠেছে। একসঙ্গে সকলে বলে উঠল, না মাস্টারবাবু। আজ আর জল না নিয়ে বাড়ি ফিরছি না। তাদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভেসে আসতে লাগল নিশাচর পাখির কর্কশ রব। আর দূরে সড়-পেতেলের জঙ্গলে শিয়ালের ডাক। রাত্রি দুপুর নাগাদ জলের মোড় ফিরল। তরতর করে জল এগোতে লাগল পদ্মপুকুরের দিকে। জগবন্ধু মাস্টারের সঙ্গে অনেকেই ফিরে এল পদ্মপুকুরের পাড়ে। তেঁতুল তলার বাঁধা ঘাটে বসে প্রতীক্ষা করতে লাগল। জগবন্ধু মাস্টার বলল, দেখলে তো তোমরা, একতার কী মহান সাফল্য। কথায় বলে, দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাই লাজ। আর হারবেই বা কেন?

ভোর হয়ে এসেছে। পূর্ণিমার চাঁদ হেলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। এখনও জোনাকি পোকাদের ভিড় তেঁতুল গাছের পাতায় পাতায়। এরই মধ্যে পাখির দল রাত্রির শেষ প্রহরের কথা ঘোষণা করল। দেখতে দেখতে পুব দিক ফর্সা হয়ে এল। সকলের বুকের ভিতর অসীম আগ্রহ। কখন জল আসে। হঠাৎ ক'জন লোক চিৎকার করে উঠল, মাস্টারবাবু পদ্মপুকুরে জল পড়েছে—দেখে যান। সকলেই হৈ-হৈ করে ছুটে গেল। জগবন্ধু মাস্টারও গেল পায়ে পায়ে। না স্বপ্ন নয়! সত্যই দাঁতীন ঝর্ণার জল পড়েছে তৃষ্ণাতুর পদ্মপুকুরের বুকে।

ছবি ঃ সুফি

সল্টলেক সিটি, কলিকাতা ৬৪ থেকে অরূপরতন ভট্টাচার্য তাঁর স্বর্গত পিতৃদেব ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পুণ্য স্মৃতির স্মরণে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন।

তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

অধ্যাপক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তুঃ

সাফল্যের পথ দীর্ঘ ও বন্ধুর

লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০শে আশ্বিন, ১৩৯২। প্রতিযোগিতার ফলাফল আগামী পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

প্রথম পুরস্কার—১৫ টাকা

দ্বিতীয় পুরস্কার—১০ টাকা

নতুন ধাঁধা

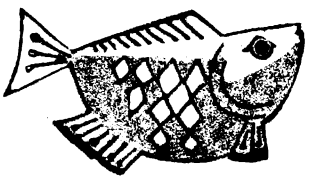

[১] উল্টো সোজা একই কথা,
মানুষেরই নাম সেথা।
তৃতীয় ষষ্ঠে জনক নাতি,
চতুর্থে পঞ্চমে রক্তিম অতি।
দ্বিতীয় পঞ্চমে খেলার জিনিস,
সাত অক্ষরে নামটি ফিনিস্।
সুজাতা পাল/রেলওয়ে কলোনী, ফিফথ্
এভিনিউ, খড়গপুর

[২] পেট কেটে বাঁদিক
মাথা কেটে মূল্য
সকলের প্রিয় খাবার
আছে কি আর তুল্য ?
জয়দেব চক্রবর্তী/নবব্যারাকপুর

[৩] আগে পিছে কথা কও
মধ্য অন্ত মিলে লও
তিনে মিলে ঝগড়া করো
উত্তরটা কি বলতে পারো ?
তন্ময়, দুলাল ও মৃন্ময় নাথ
নস্করপুর/২৪-পরগণা

[৪] প্রথমেতে দেখি নি
জন্তু দেখি শেষটাতে,
সবটা কিন্তু যায় চলে
পলক না ফেলিতে।
পাপিয়া ও চন্দন বিশ্বাস
করিমগঞ্জ/আসাম

আষাঢ় সংখ্যার ধাঁধার উত্তর:–
[১] আলো [২] বাতিল [৩] ফেলনা [৪] অভিধান
ছবিতে মজার উত্তর:– গ-মেয়েটির।

চৈত্র মাসের ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নামঃ

।। কলকাতা ।।
মিঠু, শংকর, সঞ্জয়, বুড়ো, মা, বাবা, কাকু, কাকীমা, সন্টু / নারকেলডাঙা, কলকাতা; বাচ্চু, গোপাল, রিঙ্কু, নাড়ু ও প্রতিমা চৌধুরী / সল্টলেক, কলকাতা-৬৪; দেবশ্রী, শ্যামশ্রী, দীপ্তি, দীপন ও কৌশিক বসু / বেহালা, রায় বাহাদুর রোড-৩৪; দীপু, শেফু, মিলি, নন্টা, রিধি ও বিলু / আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৫;

।। হাওড়া ।।
মৌ, সুস্মিতা, সুমিতা, শান্তা, সমতা ও দিদিভাই / উত্তর বালটিকুরী, খালধার পাড়া, হাওড়া; গিরিন, স্বাতী, রমা, পিকলু ও শৈলেন চট্টোপাধ্যায় / সালকিয়া; মৌমিতা, পাপিয়া, পিঙ্কু, টিঙ্কু ও বুবাই / বাগনান; মা-বাবা, জেঠু, জেঠি, রাণা, মাম, বুবু ও মিতু/ বেলিলিয়াস রোড; হাওড়া-১

।। ২৪ পরগণা ।।
সোমা দাস / ব্যারাকপুর; ঈশিতা বসু, সৌমিত বসু / নৈহাটি, স্টেশন রোড; বাদল, টিঙ্কু, জয়, মামন, বাচ্চু ও তিপু / সোনারপুর, বৈকুণ্ঠপুর; বুলবুল, সীমা, জয়া ও ময়না দত্তরায় / স্টেশন রোড, গড়িয়া;

।। বর্ধমান ।।
কাঞ্চন, সীমা, পুনু, সুকু, অঞ্জু ও রজত কর্মকার / দোমোহানী বাজার, বর্ধমান; রোজী, রিনি, মাথুর / বেনাচিতি, দুর্গাপুর-১৩; বুবু, পুচু, রীতা, মিঠু ও জিতেন দা / আমবাগান, দুর্গাপুর–১৩; অনিরুদ্ধ, মিঠুন গোস্বামী / শিবাজী রোড, দুর্গাপুর; দেববাণী, দেবাদিত্য, অমিতাভ ও মন্দিরা চক্রবর্তী / সোদপুর কলিয়ারী, আসানসোল;

।। পুরুলিয়া ।।
শান্তি, অভিজিৎ, মন্দা, জটু, দশমী, ইতিকা, মা, বাবা, ঠাকুমা ও আশিস / মানবাজার, মধুপুর সেনমেলা; বুড়ি, শ্রীদেবী, মেঘদূত, বিমান ও সবিতা / মানবাজার, মধুপুর; গৌতম দত্ত, বুলাকি, সত্য, নজরুল, জয়দেব, বিশ্বনাথ, প্রতাপ, ছায়া, রীণা, শ্যাম ও বেলা মুখার্জী, ছন্দা সুবুদ্ধি, কানাই সুবুদ্ধি, ঝুনুদি, জগন্নাথ, গেঁড়ু ব্যানার্জী / মানবাজার রাধামাধব বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা ও মানবাজার হোলিডে হোমের ছাত্র-ছাত্রীরা; অভিজিৎ, আশিসবাবু, ছোটোভাই, বিজয়া, বাবা ও মা/ মানবাজার, বলুড়ি; অনুপম, প্রদীপ, শান্তিময়, বাসব, করবী, সুধীর, সুবল, সৌমেন, অঞ্জনা, সুবীর, মুনমুন, পম্পা, রঞ্জু ও জ্যোৎস্না / মানবাজার; শিউলি, স্বপন, রাখি, অনু, কাকা, কাকীমা / সান্তালডি;

।। বাঁকুড়া ।।
পিন্টু, বুজু, দিদি, সুচরিতা, সোনান, বনান ও ভাই / হাড়মাসড়া; বুবু পুচু, ইতিকথা ও শুয়া / স্কুলডাঙা;

।। নদীয়া ।।
মহুয়া বসু, কৌশিক বসু, নোটন দেব, শেফালী সরকার / পাটুলি, বাদকুল্লা; দেবকী, দেবশ্রী, দেবযানী ও দেবপমা বসু / রাণাঘাট; নান্কু, রজত, কমল ও তিস্তা চক্রবর্তী / মদনপুর; পিংকাই, নারু, মুন্নি ও বাবা-মা / শান্তিপুর;

।। আসাম ।।
মা, শ্যামল, শ্রাবণী, গীতা, রীতম ও উদয় / লামডিং; প্রদীপ, তাপস, পুসক, অমল, মিন্টু, রিমা, মোহবুব, মামন, দীপু, মণি, সুমন, মনটি ও বাবলি / মাহুরবাজার, এন. সি. হিলস্; প্রভাকর, বাসন্তী, তাপস, মানস, শুভ্রা ও সমরজিৎ চক্রবর্তী / লামডিং, আসাম।

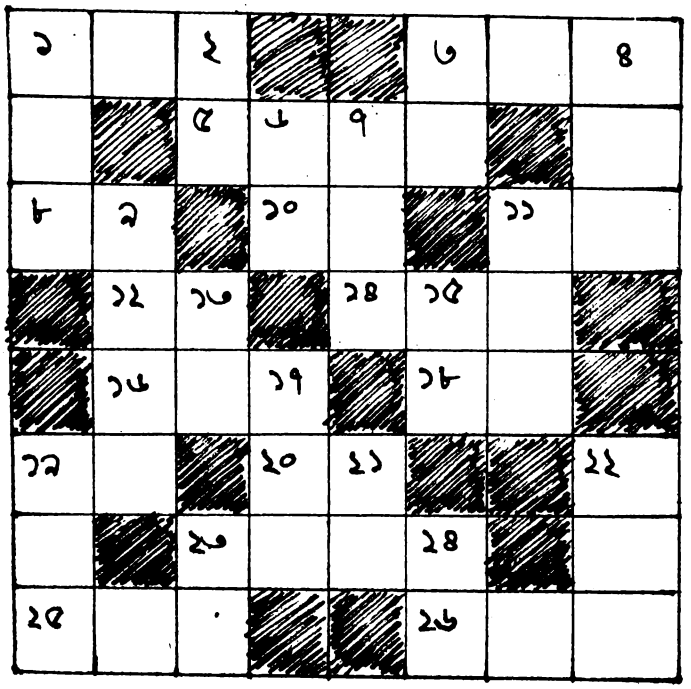

শব্দমালা :–
–এটি তৈরি করেছেন
তপোময় ঘোষ
শিবলুন/কাটোয়া কলেজ
বর্ধমান

সূত্র :

পাশাপাশি

[১] ফাল্গুনের ফুল এটা
আলো করে বন গোটা।

[৩] কাহিল কিংবা জখম
এ শব্দটাও ঐ রকম।

[৫] সর্বদাই বটে
শিব নিঃশ্বাসে ঘটে।

[৮] রামের বড় ছেলে
অঙ্কেও মেলে।

[১০] রসায়ন কর লক্ষ্য
অ্যাসিডের বিপক্ষ

[১১] আওয়াজ কিংবা শব্দ
উল্টানো 'বর' জব্দ।

[১২] নিঃশ্বাস ধরার সময়
যে জিনিসে তা হয়।

[১৪] প্রথম সূর্যোদয়
যে দেশে হয়।

[১৬] শরৎ কবিতায় যে লতায়
মৌমাছি খোঁজ নিয়ে যায়।

[১৮] ফসল ফলানো ঠাঁই
উল্টে আছে ভাই।

[১৯] পিচবোর্ড কেটে হয় খেলাও
রাশিয়ার খবর মেলাও।

[২০] লখিন্দরের ডাকনাম
খালটাকে উল্টালাম।

[২৩] নক্ষত্র সন্ধ্যাকাশে
হাতে পেয়ে শিশু হাসে।

[২৫] তিন আখরে মেয়ে
ভাবলে যাবে পেয়ে।

[২৬] পাইন গাছের তেল
দেখায় অনেক খেল।

ওপর-নিচ

[১] বন্দীর হাতে থাকে
কে ছিঁড়বে তাকে ?

[২] 'নাও' সাধুভাষায় কও
উল্টিয়ে লাঙল বও।

[৩] চর্মে ঝরে, নয়কো মেদ
বলতে পারো এটা স্বেদ।

[৪] ব্যঙ্গে তা নবাব
বড়লোকী স্বভাব।

[৬] 'রাখো' শুধু সাধু ভাষা
আটক ও খাসা।

[৭] খোলো খোলো দ্বার
রাখিও না আর।

[৯] ভালো নয় পাজি,
শেষে 'তিরিশ দিনে' রাজি।

[১০] যুদ্ধ যেখানে ঘটে
সেখানটাই বটে।

[১৩] অপাচ্য খাদ্য
খুকুর পায়ের বাদ্য।

[১৫] চলতিতে খাবার পাত্র
পান আকারে কাটা মাত্র।

[১৭] বৈরাগীর কপালে থাকে
মাটি দিয়ে সুন্দর সাজে।

[১৯] যাতে করে দাও রাঙঝাল
খোঁজ নাও গিয়ে কামারশাল।

[২১] যাতে তোমরা লেখ
লেখাপড়া শেখ।

[২২] একজন রুশ নেতা
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জেতা।

[২৩] কানের প্রধান কাজ
বলতেই হবে আজ।

[২৪] উল্টানো 'তারা'
দিনের আকাশে হারা।

[উত্তর আগামী সংখ্যায়

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

কেমন আছো সকলে? দেখেছো তো ঝির ঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই। কখনো জোরে কখনো আস্তে। আকাশে কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে রোদের ঝলক যেন শরতের শুভ্রদিনের হাতছানি। সত্যি ভালো লাগে না এই একঘেয়ে বৃষ্টি। ভেজা ভেজা বিকেলে এক একদিন ভেসে আসে হাসনুহানার গন্ধ। একটা জিনিস কি কখনো লক্ষ্য করেছো–দোপাটি, জিনিয়া, বকুল, কদম ছাড়া বর্ষার প্রায় আর সব ফুলই সাদা রংয়ের। রজনীগন্ধা, কামিনী, জুঁইয়ের গন্ধ বর্ষার সন্ধ্যাগুলোকে মাতিয়ে রাখে। কলকাতায় তো আর ও সব বিশেষ পাওয়া যায় না। ওর জন্যে যেতে হবে গ্রামে। গ্রামে বর্ষার রূপই আলাদা। খাল, বিলে থৈ থৈ জল। ভোর না হতেই চাষী ভাইরা মাঠে। চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ।

এই মাসেই তো আবার ঝুলন। রাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা। তোমরা যারা বাড়িতে ঝুলন সাজাও তারা তো দারুণ ব্যস্ত। রথের মেলায় কেনা পুতুল দিয়ে ঝুলন সাজাতে হবে তো। কিন্তু মজা কি জানো–ঝুলন এ বছর ভাদ্র মাসে। বরাবর কিন্তু শ্রাবণেই হয়।

তোমাদের কাছ থেকে রোজ কতো যে চিঠি পাচ্ছি, কতো লেখা, কতো ছবি। কিন্তু তোমরা এখনো কেউ কেউ পুরো নাম, ঠিকানা, বয়েস, স্কুলের নাম, কোন ক্লাশে পড়ো সে সব দিচ্ছো না। ও সব না থাকলে লেখা বা ছবি ভালো হলেও যে ছাপা যাবে না।

এদিকে আমাদের এক বন্ধু জানতে চেয়েছে রাশি কাকে বলে।

এক কাজ করো। ছাদে উঠে কিংবা বাইরে এসে মাথার ওপরে আকাশের দিকে তাকাও। আকাশটা কেমন দেখাচ্ছে? অর্ধবৃত্তাকার তাই তো। আমাদের দৃষ্টির বাইরে আর একটা অর্ধবৃত্তাকার আকাশ আছে। সেটা পায়ের নিচের দিকে। এবার কল্পনা করো দুটো আকাশ জোড়া হয়ে একটা পূর্ণ বৃত্তাকার আকাশ হলো।

প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিদরা এই পূর্ণ বৃত্তাকার আকাশে সূর্যের চলার পথে বারোটা তারা চিত্র কল্পনা করেছিলেন। এই চিত্রগুলিই রাশিচক্রের বারোটা রাশি। এদের নাম তোমরা জানো–মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। এদের মধ্যে দুটিতে মানুষের মূর্তি, সাতটিতে জীবজন্তু আর বাকি তিনটি অন্য মূর্তি।

মানুষের জন্মের মুহূর্তে চাঁদ এই বারোটি মূর্তির মধ্যে যেখানে থাকে তার নামেই মানুষের রাশি হয়।

তোমাদের নিশ্চয় অবাক লাগছে। জানতে ইচ্ছে করছে সূর্যের চলার পথ কি! রোজ ভোরবেলায় তোমরা সূর্যকে পুব দিকে উঠতে দেখো। সন্ধ্যেবেলায় আবার অস্ত যেতে দেখো পশ্চিম দিকে। তার মানে পুব থেকে পশ্চিমেই হলো সূর্যের চলার পথ। তাই কি? আসলে পৃথিবী পশ্চিম থেকে পুবে ঘুরছে বলেই আমরা ঐ রকম দেখি।

সূর্যদেব চলেছেন আকাশভরা তারাদের মধ্যে দিয়ে। সূর্যের আলোয় গ্রহ তারাদের দেখা যায় না। সূর্য কিন্তু চলার পথে রোজ এক ডিগ্রি করে সরে যাচ্ছেন।

প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিদরা সূর্যের এই চলার পথের ওপরেই ঐ বারোটি চিত্র কল্পনা করেছিলেন। বারোটা চিত্রই আমাদের বারোটা রাশি।

কিছু বুঝলে? এই নিয়ে অবশ্য তোমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। শুধু জেনে রাখো সূর্যর চলার পথে তারায় তারায় তৈরি বারোটা কাল্পনিক চিত্র আমাদের বারোটা রাশি। এবার থেকে নিশ্চয়ই তোমার কি রাশি জিজ্ঞেস করলেই এ সব কথা তোমাদের মনে পড়ে যাবে। তাই না?

সৌমেন দাস (দক্ষিণী হাউজিং এস্টেট, বড়তলা, কলকাতা-১৮) একটা ভুল ধরেছে। দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ ১৫৫৬ সালেই হয়েছিলো। খান খানান গল্পে ওটি ভুল ছাপা হয়েছে। ১৩৫৬ নয় ১৫৫৬ই হবে। এই ভুল ধরে **অনিন্দ্য রায়চৌধুরী**ও (কাঁসারী পাড়া রোড, কলকাতা-২৫) চিঠি দিয়েছে। **শমীকা বসু** (কলকাতা)–আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্পের কথা যে তোমরাই জানতে চেয়েছিলে। তোমরা যা জানতে চাও দাদুমণি তো তাই লিখবে! নয় কি! তুমি কি পেলে খুশি হও জানিও কেমন। **রত্নদীপ ভট্টাচার্য** (শিলং) তুমি যা যা চাইছো–

শুকতারায় প্রায় তার সবই তো দেওয়া হচ্ছে। লেখকদের শুকতারার ঠিকানাতেই চিঠি দিতে পারো।

শান্তনু চক্রবর্তী (মালিগাঁও,কামরূপ, আসাম)–ঠিকই তো তোমাদের যা জানার তা তো দাদুমণিকেই লিখবে। কিন্তু খেলার প্রশ্নগুলো তোমাদের জিজ্ঞাসা বিভাগেই পাঠাতে হবে। তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর তো গত মাসের শুকতারায় পেয়েছো। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন–বিশ্বের প্রথম উইকেটরক্ষক কে তা তো আমিও জানি না। তোমরা কেউ জানো নাকি? **শ্যামল বসু** (ইছাপুর, নবাবগঞ্জ)–শুকতারার পুরোনো লেখাগুলো আবার ছাপলে কি ভালো হবে? তার চেয়ে একটা 'সেরা শুকতারা' বই বের করলে কেমন হয়?

আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থেকো সকলে।

দাদুমণি

তোমাদের পাতা

এক দুই তিন

এক দুই, তিন
খাব হাঁসের ডিম।
চার, পাঁচ, ছয়
ডালে পাখি বসে রয়
সাত, আট, নয়
ক্রিকেটে ভারতের জয়।
দশ, এগারো, বারো
দাবা খেলতে পারো?

মৌমিতা ভট্টাচার্য
বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী
সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল
কলিকাতা

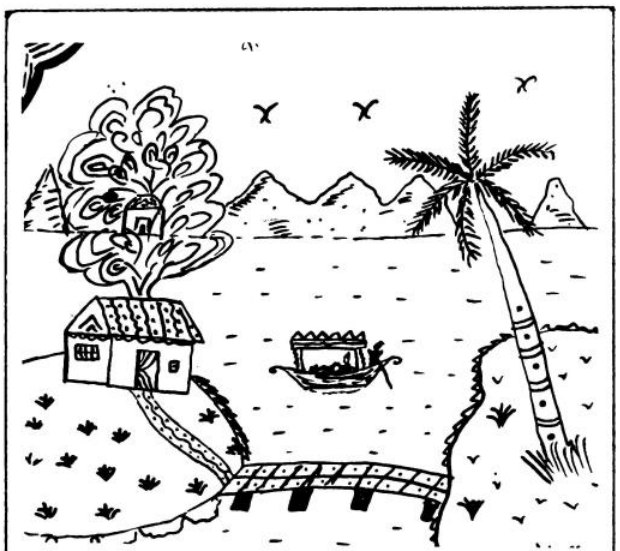

মৌসুমী ঘোষাল
বয়স দশ
ওল্ড সেটেলমেণ্ট, খড়গপুর

ভুল-বোঝাবুঝি

সেবার উত্তর ভারত ভ্রমণের পর আমরা কলকাতায় ফিরছিলাম। যে ট্রেনটা করে আমরা ফিরছিলাম সেই ট্রেনটার নাম ঠিক মনে নেই। কানপুরের কাছে একটা ছোট স্টেশন আছে। সেখানে এসে আমাদের ট্রেনটা থামলো।

তখন ভোর হয় হয়। ট্রেনটা থামতেই একট চা-ওয়ালা 'চা'-'চা' বলতে বলতে আমাদের কামরার দিকে এগিয়ে আসছিল। আমাদের কামরার অন্যপাশে একজন অবাঙালী ভদ্রলোক তখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। চা-ওয়ালার 'চা' 'চা' ডাক শুনে তিনি হঠাৎ 'ক্যা হুয়া' 'ক্যা হুয়া' বলতে বলতে লাফিয়ে উঠলেন। তারপর হাঁ করে চা-ওয়ালার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার ধপ করে শুয়ে পড়ে নাক ডাকাতে লাগলেন।

প্রথমটা আমিও হকচকিয়ে গিয়েছিলাম ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখে। পরে বুঝলাম একটা ভুল-বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। উনি 'চা'-'চা' ডাকটা নিশ্চয়ই অন্য অর্থে ধরেছিলেন অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে ভেবেছিলেন বুঝি ওঁকেই কেউ 'চাচা' অর্থাৎ 'কাকা' বলে ডাকছে।

প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
বয়স তেরো, সপ্তম শ্রেণী
ক্যালকাটা বয়েস স্কুল
কলকাতা

কাকলি সাহা বয়স সাত, তৃতীয় শ্রেণী, বড়িষা (বেহালা), কলিকাতা

ভালোবাসা ও পণ

ভালোবাসো ! ভালোবাসো !
ভালবাসবো কাকে ?
ভালোবাসো নিজ দেশকে
ভালোবাসো দেশের মানুষকে
ভালোবাসো দেশরূপী পরিবারকে।
দুই-শত বছর ধরে যে দেশ
করেছে বিদেশী শোষণ।
হে দেশের জন
এই দেশের তরে
জীবন করিব দান
এই কর পণ।

স্বাতী ভট্টাচার্য
বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণী
গিরিডি, বিহার

বকুল ফুল

এক যে আছে ছোট্ট ফুল,
নাম হলো তার বকুল ফুল।
ফোটে যখন গন্ধে তারই,
মন ভরে যায় সবাকারই।
আঁচল ভরে ভোরের বেলা
কুড়িয়ে এনে গাঁথি মালা।

সুদেষ্ণা সরকার
বয়স নয়, চতুর্থ শ্রেণী
গভর্মেন্ট স্পনসার্ড গার্লস হাই স্কুল
দমদম রোড , দমদম

জো

আমাদের বাড়িতে একটা কুকুর আছে। তাকে বিদেশ থেকে আনা হয়েছিল তাই অনেক ভেবেচিন্তে আমরা ওর নাম রাখলাম জো। ওকে যখন আনা হয় তখন ওর বয়স মাত্র দুই মাস। ওকে যখন প্রথম এখানে আনা হয় তখন ও দেখতে খুব সুন্দর ছিল। ঠিক পোলার বিয়ারের মতন।

জো অন্য কোনো কুকুরকে সহ্য করতে পারে না। আমার গায়ে যদি অন্য কোনো কুকুরের গন্ধ পায় তাহলে ভৌ ভৌ করে আমাকে ভীষণ বকে।

সুতীর্থ তালুকদার
বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী, পাঠ ভবন, কলকাতা

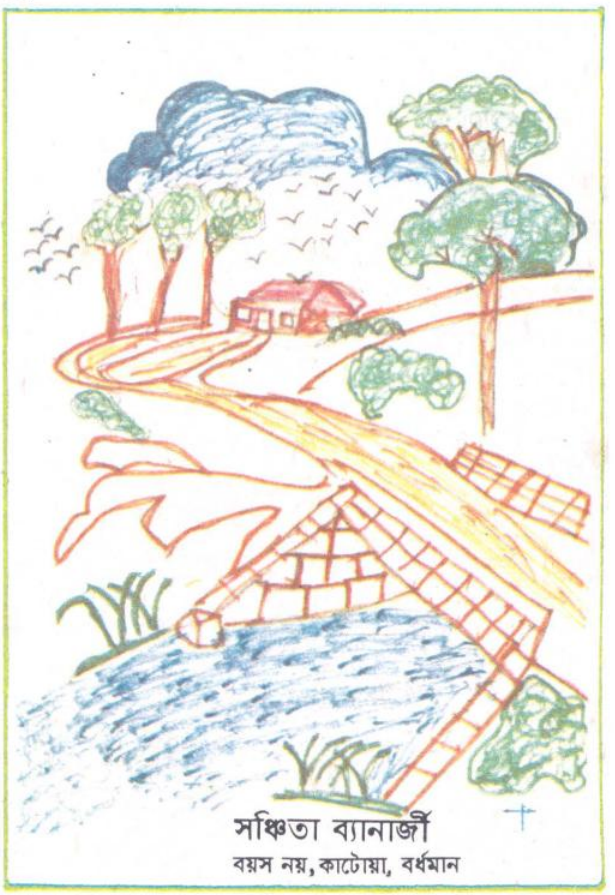

সঞ্চিতা ব্যানার্জী
বয়স নয়, কাটোয়া, বর্ধমান

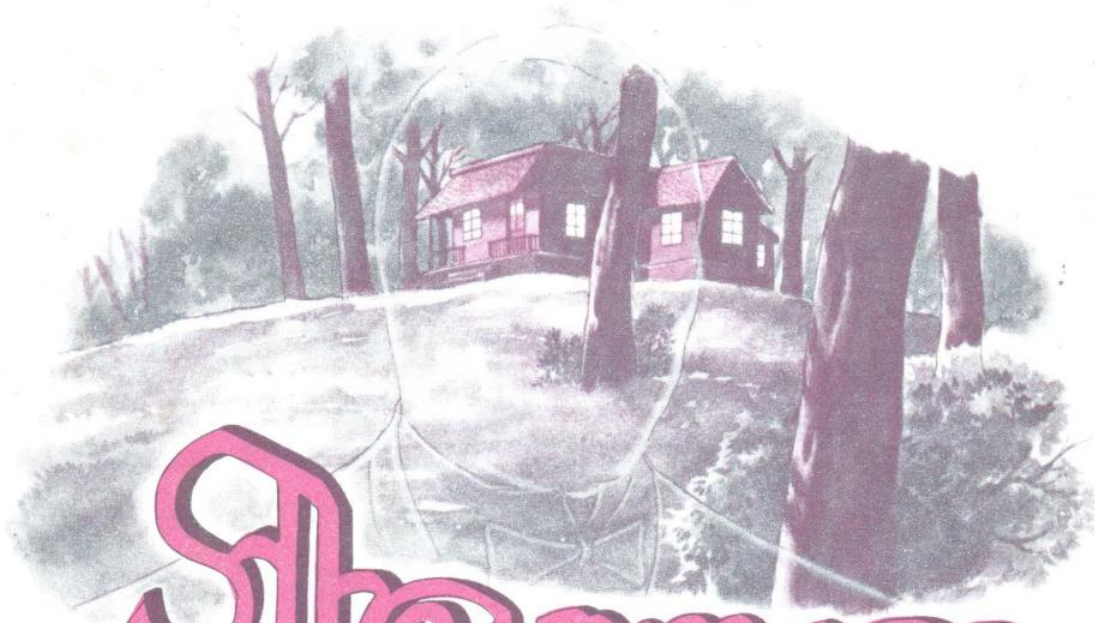

সাহেব বাংলোর ভূত

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

থানায়

ভোর হতেই আমি আর প্রসেনজিৎবাবু ফরেস্ট অফিসের একটা জীপ নিয়ে যাত্রা করলাম মৌবনি থানায় গত রাতের হত্যাকাণ্ডের খবরাখবর জানিয়ে লাশের একটা ব্যবস্থা করতে।

মেঘনাদ বসে রইলো পশুপতি ভট্টাচার্যের মৃতদেহ আগলে।

সত্যি বলতে কি গভীর রাতে জঙ্গলে ঘটে যাওয়া ওই সব কাণ্ডকারখানা এবং পশুপতিবাবুর মৃত্যুরহস্য এখনও আমায় হতচকিত করে রেখেছে। প্রসেনজিৎবাবুর অবস্থাও তথৈবচ আর মেঘনাদের কথা বলতে পারবো না—ও নিজেই তো এক রহস্যের মেঘনাদ।

গভীর রাতে জঙ্গলে লণ্ঠনের আলোর দুলুনি... ডেনিস সাহেবের বিদেহী মূর্তি... অনুসরণ... অমানুষিক হুঙ্কার—সব মিলিয়ে এখনও কোনো পরিষ্কার ছবি ফুটে উঠছে না। তবে এই সঙ্গে গতকাল দুপুরে বাংলোর গুদামঘরে গোপন সুড়ঙ্গপথ আবিষ্কার, সেখানে সিগারেটের টুকরো খুঁজে পাওয়া এবং দিনকয়েক আগে ওই পথেই সাহেব ভূতের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ব্যাপারগুলো যোগ করলে সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা চক্রান্তের আভাস মেলে।

এই পুরনো সাহেব বাংলোতে তবে কি কোনো গোপন অপরাধচক্রের কার্যকলাপ চলছে? তারাই কি এই ভূত-নাটকের স্রষ্টা? তাদের উদ্দেশ্য কি ভূতের ভয় দেখিয়ে বাংলোটাকে পরিত্যক্ত করে রাখা?

কিন্তু কী অপরাধে লিপ্ত তারা? তাদের পালের গোদাটাই বা কে?

আর পশুপতি ভট্টাচার্যই বা অমন অবস্থায় খুন হলেন কেন?

ওঁর মৃতদেহের পকেট হাতড়ে দুটি জিনিস পাওয়া গেছে—

এক, খড়গপুর-মৌবনি বাসের টিকিট।

দুই, একটি চিঠি।

বাসের টিকিট পাওয়া অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রসেনজিৎবাবু জানিয়েছেন দিনকয়েক আগে উনি নাকি কিছু সওদা করতে খড়গপুর গিয়েছিলেন। ভদ্রলোক গত কয়েক বছর যাবৎ এই মৌবনিতে একাই থাকছেন। স্ত্রীপুত্র আছে খড়গপুরে।

কিন্তু অদ্ভুত বলতে মৃত পশুপতিবাবুর পকেট থেকে পাওয়া চিঠিটা।

চিঠি না বলে সেটা একটা ছোট্ট চিরকুট বলাই ভাল। কোনো সম্বোধন নেই। তাতে শুধু ইংরাজীতে লেখা–

"আজ রাতে চন্দ্রাণী শ্বশুরবাড়ি যাবে। তোমার প্রাপ্য নিয়ে যেও। রাত ঠিক ৩-৫০ মি. সময়ে আগের মতোই জংগলে আলোর সংকেত পাবে। D কে অনুসরণ কোর।"

মেঘনাদ লেখাটা বারকয়েক পড়ে আমার হাতে দিয়ে বলেছিল, কিছু বুঝতে পারছিস?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, পশুপতিবাবু বোধহয় বিয়ের ঘটকালি করতেন, তাই বিয়ের পর পাত্রীর শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় হলে পাত্রীপক্ষ ওঁকে ঘটকালির টাকা নিয়ে যেতে বলেছে।

তোর মুণ্ডু। আমার হাত থেকে চিরকুটটা কেড়ে নিয়ে মেঘনাদ ঝাঁঝিয়ে উঠলো, বিয়ের পর পাত্রী আর শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় পেল না? মৌবনির জংগলে রাত ৩-৫০ মি. সময়তেই ঠিক শুভযোগটা পড়লো।

তাই তো! ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবলে কেমন যেন সবটাই অস্বাভাবিক মনে হয়।

প্রসেনজিৎবাবুও চিরকুটটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়তে পড়তে বলেছেন, এ তল্লাটে নতুন কোনো বিয়ে হয়েছে বলেও তো কানে আসেনি।

আমি নাক চুলকোতে চুলকোতে বলেছি, এটা কোনো সংকেত লিপিও তো হতে পারে? হয়তো চন্দ্রাণীর শ্বশুরবাড়ি যাবার অন্য কোনো অর্থ আছে।

হিয়ার ইউ আর, মেঘনাদ মাথা নেড়ে বলেছে, শুধু হতে পারে না, এটা তাই বটে।

সংকেতটা যে কিসের তা অনুমান করতে পারিস? প্রসেনজিৎবাবু প্রশ্ন করেছেন।

সেটা আর একটু ভাবা দরকার। তবে সাহেব বাংলোর ভূত সাহেব কিনা বলতে পারবো না কিন্তু সে যে রক্তমাংসেরই মানুষ তা আমি এখুনি বাজি রেখে বলতে পারি।

প্রসেনজিৎবাবুর কণ্ঠস্বরে অন্যমনস্কতা ভাঙলো।

চলন্ত জীপের স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে প্রসেনজিৎবাবু বলেন, এসব কী শুরু হয়েছে বলুন তো অর্ণববাবু। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দু'দুটো লাশ পড়লো, ঘটনাগুলো কেমন বিদকুটে অস্বাভাবিক দেখেছেন।

আমি বললাম, অস্বাভাবিক রহস্যের প্রকাশটা অস্বাভাবিক হওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

প্রসেনজিৎবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, পশুপতি ভট্টাচার্যের মতো সাত্ত্বিক ধার্মিক মানুষ যে কোনো অসামাজিক অপরাধ কর্মের সংগে জড়িতে থাকতে পারেন এ আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।

আমি বললাম, আপনি তো মৌবনির ফরেস্ট রেঞ্জার। সেই হিসেবে এ এলাকার এমন কিছু ব্যাপারই কি কানে আসেনি যা থেকে কোনোসূত্র মিলতে পারে?

প্রসেনজিৎবাবু কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বোধহয় ভাবলেন, তারপর বললেন, না মশাই। এসব জংগল এলাকার একটাই প্রধান সমস্যা, তা হলো বে-আইনী কাঠুরেরা। রাতের আঁধারে জংগলে ঢুকে গাছের পর গাছ কেটে পাচার করে। এর ওপর এখানে এই ভূতুড়ে কান্ড তো আছেই, বরং সেদিক থেকে কিছুটা সুবিধেই হয়েছে বলতে পারেন। চোরাই চালানের কাঠুরেরাও রাতবিরাতে বড় একটা জংগলে ঢোকে না।

প্রসেনজিৎবাবু যাই বলুন, সাহেব বাংলোকে আশ্রয় করে একটা শয়তানী চক্র যে ফাঁদা হয়েছে তা অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

এখন সব থেকে আগে প্রয়োজন সেই চক্রের মুখোশটা খুলে দেয়া। এটুকু বোঝা যাচ্ছে চক্রের আসল নায়কটি একটি আস্ত ঘুঘু।

কথা বলতে বলতে আমাদের জীপ এসে থামলো মৌবনি থানার সামনে।

দূরত্ব তো নেহাত কম নয়। কলকাতার মতো দু পা এগুলেই নতুন থানার অস্তিত্ব এসব দূর গাঁ-গঞ্জে ভাবাই যায় না। বিশেষতঃ মৌবনি মেদিনীপুরের এক অতি নগণ্য এবং অবজ্ঞাত অঞ্চল।

থানা বলতে একটা একতলা পুরনো পাকা বাড়ি। হতশ্রী চেহারা। ততোধিক হতশ্রী চেহারার একজন হোমগার্ড থানার সামনে রাইফেল ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা সোজা ভেতরে ঢুকে গেলাম।

সামনের ঘরটাই অফিস।

ঘরের মধ্যে দুজনকে দেখলাম। প্রথমজন এক এ. এস.আই.। টেবিলের ওপর পা তুলে বসে মেজাজে নিজের কানে পাখির পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন। অন্যজন এক কনস্টেবল–বসে বসে খৈনি ডলছে।

বোঝাই যায় থানায় আপাততঃ কর্মতৎপরতা নেই। বেশ একটা ঢিলেঢালা ভাব।

এ. এস. আই. ভদ্রলোক প্রসেনজিৎবাবুর দিকে

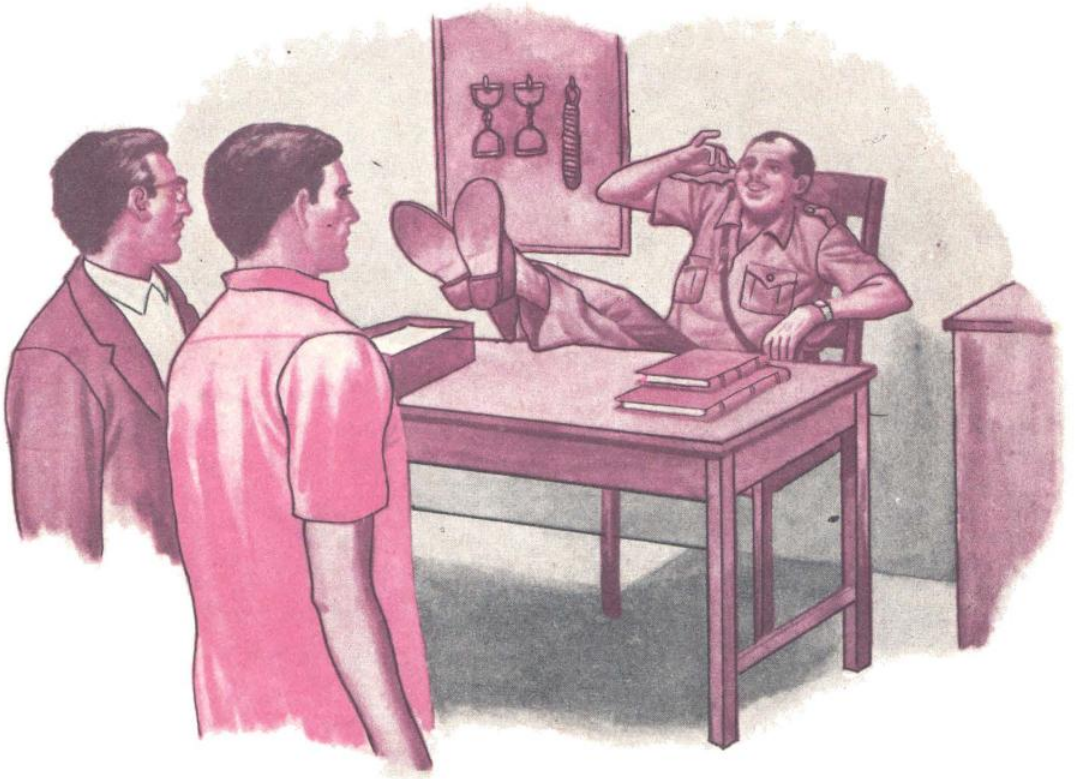

তাকিয়ে বললেন, কী ব্যাপার স্যার, আপনি এই সাত-সকালে...,

বুঝলাম স্থানীয় রেঞ্জার হিসাবে প্রসেনজিৎবাবুর বেশ পরিচিতি আছে। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক।

প্রসেনজিৎবাবু বললেন, মিঃ পোদ্দারের সঙ্গে একটু দরকার ছিল।

এ. এস. আই. ভদ্রলোক বললেন, কিন্তু বড়বাবুকে তো এখন পাবেন না স্যার। ওঁর এখন ডিউটি অফ। এখন আমিই ডিউটিতে আছি। আমায় বলতে পারেন।

প্রসেনজিৎবাবু একটু থমকে ভেবে বললেন, ওঁকে বলতে পারলেই সুবিধে হতো। মিঃ পোদ্দার কি কোনো কাজে বেরিয়েছেন?

না, তা অবশ্য বেরুননি।

তবে কি কোয়ার্টারে ঘুমোচ্ছেন?

না, তাও নয়।

এবার অবাক হবার পালা আমাদের। ডিউটিতে নেই, কোয়ার্টারে নেই, বাইরে বেরুননি, তবে গেলেন কোথায় উনি?

এ. এস. আই. ভদ্রলোক আমাদের মনের অবস্থাটা বোধহয় অনুমান করেই গোঁফের ফাঁকে একটু মুচকি হেসে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর প্রসেনজিৎবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, বড়বাবুকে কি আপনাদের একান্তই দরকার?

খুব দরকার।

তবে জানলার ধারে আসুন, দেখিয়ে দিচ্ছি, বলতে বলতে জানলার কাছে গিয়ে বাইরে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, সামনের পুকুরটার ওপারে ওই যে বাড়িটা দেখছেন, আপাততঃ ওটাই আপনাদের গন্তব্যস্থল হতে পারে।

কিন্তু ও বাড়িটা কার? ওখানে মিঃ পোদ্দার থাকেন বলে তো শুনিনি।

ওটা বড়বাবুর শ্বশুরবাড়ি। বড়বাবুর শ্যালকমশাই ছেলের জন্মদিনে ওঁকে সপরিবারে নেমন্তন্ন করেছেন। গতকাল রাতে গেছেন নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। আজ দুপুর নাগাদই ডিউটিতে আসবেন।

কিন্তু আমার পক্ষে তো অতক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। প্রসেনজিৎবাবু বললেন।

কিছু মনে করবেন না স্যার, এই হলো পুলিশের চাকরি। ব্যক্তিগত জীবন বলে বিশেষ কিছু থাকে না। তবু লোকে আমাদের ভুল বোঝে। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না স্যার, আমি শম্ভুচরণকে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি—বলতে বলতে কনস্টেবলের দিকে ফিরে তাকাতেই সে খটাস করে একটা সেলাম ঠুকলো।

এ.এস.আই. বললেন, রেঞ্জার সাহেবকে এক্ষুণি নিয়ে যাও বড়বাবুর কাছে। খুব জরুরী দরকার।

এক ডেলা খৈনি মুখে কনস্টেবল শম্ভুচরণ কী বললো শোনা গেল না, তবে বুঝলাম সে আমাদের তাকে অনুসরণ করতে বলছে।

আমরা তার পিছু পিছু বেরিয়ে এলাম থানার বাইরে।

তিনকড়িবাবুর ধোঁকা

শম্ভুচরণই তিনকড়িবাবুর শ্বশুরবাড়ির সামনে গিয়ে কড়া নেড়ে হাঁকডাক শুরু করলো।

কিছুক্ষণ বাদে যিনি দরজা খুলে দিলেন, সে ভদ্রলোকের বয়স বছর পঞ্চাশ-এর কম হবে না। একহারা চেহারা, মাথায় কাঁচা-পাকা বাবরি ধরনের চুল, লম্বা সাদা জুলফি, পরনে খদ্দরের পাঞ্জাবি, পায়জামা। কেমন যেন কবি কবি চেহারা।

বললেন, কাকে চাই ?

শম্ভুচরণই বললো, এঁরা খুব একটা দরকারে এসেছেন বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে।

প্রসেনজিৎবাবু বললেন, আমার নাম প্রসেনজিৎ মজুমদার। এখানকার ফরেস্ট রেঞ্জার। আমার বাংলোর সামনে জঙ্গলে গত রাতে একটা খুন হয়েছে, সেই ব্যাপারেই...

ও, বুঝতে পেরেছি, প্রসেনজিৎবাবুর কথা শেষ হবার আগেই ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম মণিশঙ্কর দত্ত। তিনকড়ি আমার ভগ্নীপতি। আপনারা ভেতরে এসে বসুন। আমি ডেকে দিচ্ছি।

মণিশঙ্করবাবুর পিছু পিছু গিয়ে আমরা যে ঘরটায় বসলাম, সেটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে যে কেউ বলবে সেটা একজন আর্টিস্টের ঘর।

দেয়ালে সুন্দর সুন্দর পেন্টিংস। ঘরটা রুচিসম্মত ভাবে সাজানো।

পরে জেনেছিলাম উনি সত্যিই একজন ভাল চিত্রশিল্পী। প্রথম জীবনে আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে কলকাতায় কিছুদিন শিল্পচর্চা এবং সাধনা করেছিলেন। তারপর বাবা মারা যাওয়ার পর গ্রামে ফিরে আসেন। এখানে ওঁর বিরাট জোত-জমি দেখাশোনা করেই সময় কেটে যায়। কিন্তু শিল্পচর্চার সঙ্গে সম্পর্ক চুকলেও শিল্পবোধ যে এখনও উনি হারাননি তা যে কেউ ওনার ঘরে ঢুকলেই বুঝতে পারবেন।

তিনকড়ি পোদ্দার এসে ঘরে ঢুকলেন।

পরনে লুঙ্গি, হাতে দাঁতন।

খালি গায়ে বিশাল বপু বর্তুলাকার ওই দেহটা এই মুহূর্তে আরও কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে। ভুঁড়ির সাইজ দেখে মনে হচ্ছে গত রাত্রে নেমন্তন্নের বহরটাও বেশ ভালই ছিল।

প্রসেনজিৎবাবুর মুখে সব কিছু শুনে তো হাঁ হাঁ করে উঠলেন ইন্সপেক্টর পোদ্দার, বললেন, এ তো সাংঘাতিক কেস। রীতিমত তদন্ত হওয়া দরকার।

এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, গতকাল কিন্তু আমায় আপনারা দু বন্ধু রীতিমত ধোঁকা খাইয়ে দিয়েছিলেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বললাম, বিশ্বাস করুন, গতকাল জঙ্গলে আমরা সত্যিই একটা লাশ পড়ে থাকতে দেখে আপনাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু অত চটপট লাশ কি করে উবে গেল তা এখনও ভাবতে পারছি না...বলতে বলতে থেমে বললাম, আর সে অভিজ্ঞতার কারণেই তো মেঘনাদ নিজে এখন লাশ পাহারায় থেকে আমাদের দুজনকে পাঠিয়েছে বিশেষ করে আপনাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখাতে।

ইন্সপেক্টর তিনকড়ি পোদ্দার হাসি হাসি মুখ করে আমার কথা শুনে বললেন, মশাই, আমি সে ধোঁকার কথা বলছি না, আপনাদের আসল ধোঁকা আমি ধরে ফেলেছি।

আসল ধোঁকা ! তার মানে ?

তার মানে গতকাল আপনারা দুজন নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে আমায় ধোঁকা দেবার চেষ্টা করলেও আমি তখনই চিনে ফেলেছিলাম মশাই আমার ফেবারিট রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজ আর তার অ্যাসিস্টেন্ট অর্ণব সেনকে। কি ভাবে বুঝলাম জানেন ?

কি ভাবে ?

'তাজা খবর' পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত গ্রাহক মশাই। কিছুদিন আগে ওই পত্রিকাতেই ছাপা আপনাদের দুজনের একটা ফটো এখনও আমার পার্সোনাল ফাইল-এ তোলা আছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ধোঁকাটা আসলে আমিই আপনাদের কি রকম খাইয়েছি বলুন, বলতে বলতে সারা শরীর কাঁপিয়ে হাসতে শুরু করলেন।

একটা দরকারে এসেছেন বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে

প্রসেনজিৎবাবুও হাসিতে যোগ না দিয়ে পারলেন না।

ভাল লাগলো ইন্সপেক্টর পোদ্দারের এই সহজ কৌতুকপ্রিয় মনের পরিচয় পেয়ে। দিনরাত চোর-ডাকাত-অপরাধীদের নিয়ে চলতে হলেও মনের উদার সব সত্তাকে উনি যে বিসর্জন দেননি তা বেশ বোঝা যায়। তবে এই সঙ্গে এ কথাও বোঝা গেল চেহারাটা ওঁর যতই স্থূল হোক, বুদ্ধি নেহাত কম ধরেন না, না হলে গতকাল সকালবেলা আমাদের চেনা সত্ত্বেও অমন অচেনা ভান করে আমাদের বোকা বানালেন কি করে?

নিয়মমাফিক থানায় একটা ডায়েরি লিখিয়ে সঙ্গে দুজন কনস্টেবল নিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তৈরি হয়ে আমাদের জীপে উঠে এলেন মৌবনি থানার বিপুলদেহী বড়বাবু তিনকড়ি পোদ্দার।

তিনকড়ি পোদ্দার পশুপতি ভট্টাচার্যের লাশ দেখে-শুনে, ছবি তুলে বিবরণী লিখে লাশ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে যখন ফিরে গেলেন, পুবের সূর্য মাথার ওপর উঠে এসেছে তখন।

যাবার সময় তিনকড়ি পোদ্দার মেঘনাদকে বলে গেলেন, আপনি নিজে যখন হাজির আছেন, আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত। যখন যা দরকার মনে করবেন আমায় জানাবেন। এই অজ গাঁয়ে বসে যে কখনও আপনার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাব তা তো স্বপ্নেও ভাবিনি।

মেঘনাদ শুধু বলেছে, আমি যদি আপনার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারি তবে আমিও কি কম খুশি হব?

পুলিশ চলে যাবার পর আমরা বাংলোর বারান্দায় এসে বসেছি।

দিবাকর খোঁজ নিয়ে গেছে আমরা এখন দুপুরের খাবার খাব কিনা। আমরা বলেছি ওকে ঘণ্টাখানেক বাদে যেন নিয়ে আসে, এখন ইচ্ছে করছে না।

প্রসেনজিৎবাবুর আজ আর অফিস যাওয়া হয়নি।

এদিকে পশুপতি ভট্টাচার্যের মৃত্যুর খবর সমস্ত অঞ্চলটাতেই ছড়িয়ে পড়েছে। নানা লোক খোঁজখবর করতে আসছে। অনেকেই সাহেব বাংলোর ভূতের কান্ড দেখে নতুন করে ভীত হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ অনুরোধ করে গেছে, প্রসেনজিৎবাবু যেন আর দেরি না করে বাংলো থেকে চলে আসেন।

বিশ্ব-পরিচয়

মানেই

পৃথিবীর ইতিহাস

পৃথিবীর প্রতিটি দেশের বিবরণ

পাঁচশতাধিক একবর্ণও বহুবর্ণ চিত্রে সমৃদ্ধ ৭০০ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। আধুনিক গেট আপ, সুদৃশ্য বাঁধাই। দাম ৪০ টাকা।

৪০ টাকা পাঠালে রেজেস্টারী করে পাঠান হয়।

দেব সাহিত্য কুটীর / ২১, ঝামাপুকুর লেন / কলি-৯

Registration No. W.B./E.C.–60 July '85 "Suktara"